অন্ধকার

কল্যাণী দত্ত

অষ্টরম্ভা

কল্যাণী দত্ত

অষ্টরম্ভা

প্রকাশ কর্মকার চিত্রিত

ভূমিকা । ৯

প্রসঙ্গ : গর্দভ । ১৩

উষ্ট্রকথা । ২৩

প্যাঁচার পাঁচালি । ৩৭

'উন্দুর'-চরিত । ৪৫

শিবা-চরিত । ৫১

কাঙ্কুড়ি পালা । ৫৯

চিঙ্গুড়ি পালা । ৬৩

গজে চ জলদা দেবী । ৭১

ভূমিকা

'থোড় বড়ি খাড়া' আমার প্রথম বই — মধ্যবিত্তের রান্না কুটনো বাটনা নিয়ে । প্রকাশক কল্যাণী ঘোষ আমার বন্ধু, তিনি উদ্যোগী হয়ে কী কী লিখতে হবে ঠিক করে দেন, আর বহু যত্নে একরকম নিজের গরজেই বইটি তৈরি করেন। তারপর হল 'পিঞ্জরে বসিয়া' । এর প্রকাশক কিছু লেখাননি, পত্রপত্রিকা থেকে ও 'থোড় বড়ি খাড়া' থেকেও বেছে নেন। এই প্রকাশক 'স্ত্রী' উচ্চকণ্ঠে বারংবার ঘোষণা করেন তাঁরা কলেজ স্ট্রীট চেনেন না, এতে আমি দুঃখ পাই । কারণ কলেজ স্ট্রীট আমার বারো আনা প্রাণ । এঁদের জটিলতায় আজও পিঞ্জরাবদ্ধ হয়ে আছি ।

আমার কাঁদুনি শুনে অষ্টআশি বছরের বন্ধু রামগোপাল চক্রবর্তী বলেন — আরে, তোমার ইংরেজি জ্ঞান নেই আমরা জানি — না থাক, লিখছ তো বাঙলায় । পরীক্ষায় 'এসে' না লিখে যা খুশি প্রাণ চায় সরসভাবে তাই লেখ। বিস্তর নবেল, কেচ্ছা সব তাঁর পড়া ছিল — পুরো ডেকামেরন, খানিকটে চসার, বাইবেলের পেন্টাটিউখ পড়ালেন । স্টিভেনসনের 'ট্র্যাভেল্‌স্ উইথ এ ডংকি' (আমার যার নামও জানা ছিল না) । এই বোঝা থেকে যা প্রাণ চায় কুড়িয়ে গর্দভকে নিয়ে যাই শ্রীরাধাপ্রসাদ গুপ্তের কাছে — তিনি নিজে আগ্রহ করে 'দেশ' পত্রিকায় পাঠিয়ে দিলেন, ছাপা হল । তদবধি রাধাপ্রসাদ ও সাগরময় এই দুই রথীর কাছে আমি অশেষ ঋণী । পরবর্তী কালে তাঁর বহুমূল্য 'ভারতের চিত্রকলায়' গর্দভ এবং উষ্ট্রকথাকে স্থান দিয়ে শ্রী অশোক মিত্র আমাকে সম্মানিত এবং আনন্দিত করেছেন ।

ডি. এল. রায়ের নন্দলালের মতো লেখক হবার ভীষণ পণ মনে মনে অনেকের

থাকে, কিন্তু প্রকাশক মেলে না দুরূহ এবং উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের। দামি কাগজ, খাসা ছবি, পরিশ্রম, খরচ, মেজাজ, নকশা, সব 'থীমার'। আমি ইন্দির ঠাকরুনের মতো জরদ্‌গব হয়ে বেঁচে আছি। সতী পায় না ধোতি — বাকিটা বলার দরকার নেই। নগদ মূল্যে বইটি কিনে থীমার লোকশান বাঁচান — এই আমার নিবেদন পাঠকবর্গের কাছে। যাঁরা সাহায্য করেছেন প্রত্যেকের কাছে গভীর কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা রইল।

১৭ জানুয়ারি ১৯৯৭

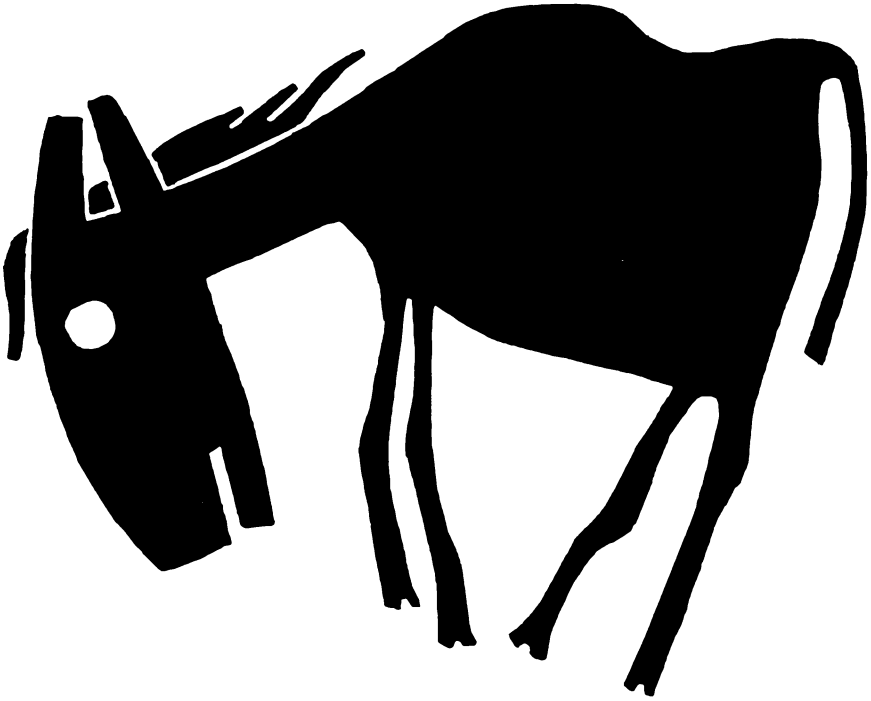

প্রসঙ্গ : গর্দভ

ছেলেবেলায় বার দুই তিন কাশী যাওয়া ঘটেছিল। যখন যে মহল্লাতে থেকেছি — বাড়ির কাছে ছিল হয় গোয়ালা পাড়া, নয় কুমোরটুলি কি ধোবার ভাঁটি । তাই হাঁড়ি কলসি, গোবর ঘুঁটে, ময়লা কাপড় আর গোরুছাগলের সঙ্গে মানুষের নির্বিচারে সহাবস্থান সহজেই মনে দাগ কেটে বসে গেছল। শিঙওয়ালা গোরুকে ভয় খেতুম, তাই শুধু ছাগল-গাধাদের সঙ্গেই আমার ভাব ছিল। রবীন্দ্রনাথের শিশুর মতো 'ধোবার বাচ্চা গাধা' টেনে নিয়ে আমিও আমার মাস্টারির প্রথম পাঠ ওই পবিত্র বারাণসী ধামেই নিয়েছিলুম। ওখানে আমার প্রতিবেশী দরিদ্র মানুষেরা কারণে অকারণে গাধার প্রতি যে নির্মম অত্যাচার করত তা আমার আজও মনে আছে। আমার অভিযোগের উত্তরে পাড়ার কোনো গুরুজনস্থানীয় স্নেহশীল ব্যক্তি একদা বলেছিলেন — আরে বাবা, মারে কি আর সাধে, গাধা হল গিয়ে বেজায় একগুঁয়ে জানোয়ার, একবার বোঝা ফেলে দিলে শুধু বিকট সুরে চেঁচায় আর লাফায়, মাল নেয় না। আর দেখ, মারলেই বা দোষ কী, ভগবান তুলসীদাস তো বলেই গেছেন —'ঢোল গমার শূদ্র পশু নারী,' এরা সব বুঝলি কিনা, 'তাড়নাকে অধিকারী'। হ্যাঁ, বুঝেছিলুম যে গাধার লাঞ্ছনা নিয়ে মাথা ঘামানো ব্যাপারটা মানুষের সুস্থতার লক্ষণ নয়।

অথচ সত্যিই গাধার মতো নিরীহ প্রাণী এই বিশাল ভূমণ্ডলে বোধ করি আর দুটি নেই। বেছাঁদ শরীর, ঢাউস কান, ইয়া লম্বা পিঠ, বেঢপ পা আর নিস্তেজ ধূসর রঙ নিয়ে, চুপটি করে সর্বক্ষণ ভারী মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে । সারাদিন মুখ বুঁজে কাজ করে যায়, মারধোর করলেও সাড়া শব্দ করে না, হাটকুড়ুন্তি ওঁচা জিনিস যা পায় তাই খায়। পঞ্চাশ ষাট বছর আগে ভদ্দরলোকের ঘরে বাঙালি শাশুড়িরা পুত্রবধূর যে গুণাবলি মনে

মনে কামনা করতেন একটি গাধার মধ্যে সেইসব গুণই ষোলো আনার জায়গায় আঠারো আনা থাকে।

সভ্যতার শুরু থেকে এই গাধাই মানুষ আর তার বোঝা বয়ে কত যে দুর্গম পথে পাহাড়ে আর মরুভূমিতে গেছে তা তো আর কারো অজানা নয়। গাধার পিঠে মাল বোঝাইয়ের আদিমতম ছবিটি আছে — মিশরের এক সমাধিমন্দিরের দেওয়ালে (২৩০০ খ্রি. পূ.)। ইলিয়াডে, শুধু ইলিয়াডে কেন সব প্রাচীন সাহিত্যেই গাধা আর খচ্চরের মাল বইবার কথা আছে। মিশর, এশিয়া মাইনর, ইরান ও ইরাক অঞ্চলে তখন গাধাই ছিল দরিদ্র মানুষের নিত্যসঙ্গী। পশুচারণ মানেই প্রধানত গাধা চরানো। এক বাইবেলেই গাধার কথা এত সুন্দরভাবে আর এত অজস্র বার বলা হয়েছে যে কুড়িয়ে বাড়িয়ে নিতে জানলে নিঃসন্দেহে তা দিয়ে একাধিক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখা চলে। ঈশ্বর এক জায়গায় মোজেসকে উপদেশ দিয়েছেন — গাধা যাতে বিশ্রাম পায় তা দেখতে এবং পথ হারানো গাধাকে পথ চিনতে সাহায্য করতে। করুণাময়ের করুণার এমন নিদর্শন পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থেই নেই। ওখানে ঘরের জোয়ান ছেলেকে সহজেই তাগ্‌ড়া গাধার সঙ্গে উপমা দেওয়া হয়েছে। মানুষের ধনসম্পত্তির হিসেব করার সময় তাই গাধারও গুন্‌তি করা হত। বাড়িতে অতিথি এলে তার বাহন গাধাকে কড়াই, ঘাস, খড় — এসব যে খেতে দিতে হত তাও সযত্নে উল্লেখ করা হয়েছে। মেয়ের বিয়ের সময় শ্বশুর জামাইকে আর পাঁচটা জিনিসের সঙ্গে প্রচুর গাধাও যৌতুক দিতেন। সম্পন্ন লোকের বাড়িতে মোটা মোটা আঙুরলতায় গাধা বাঁধা থাকত। গাধায় চড়ে পথ চলতে চলতেই তখন নায়ক-নায়িকারা প্রেম সম্ভাষণ করতেন। এমনধারা বহু ছবিতেই তখন সুস্থ গাধা আর আনন্দিত মানুষকে পাশাপাশি দেখা যেত।

এ তো গেল জ্যান্ত গাধার কথা, মরা গাধার হাড়ের দামও কত লাখ টাকা তখন যে ছিল কী বলি, ঠিক যেন দধীচির বজ্র ! আমাদের ভীমসেনের যমজ ভাই স্যামসনের সঙ্গে ফিলিস্টাইনদের যে যুদ্ধ হয়েছিল তাতে ওই মরা গাধার হাড় দিয়ে যুদ্ধ করেই তো হাজার হাজার সৈন্য স্যামসন একাই বধ করলেন; চোয়ালের হাড়টা যেখানে ফেলে দিলেন সেটাই হল 'হনুগিরি', 'জ-বোন হিল্'। দুর্ভিক্ষের সময় গাধার মুড়োরও যে দাম চড়া হত তারও উল্লেখ দেখা যায়। আজকাল যারা 'হাংগার' বা 'পভার্টি' নিয়ে ভারী ভারী বই লিখেছেন এটি তাঁদের নজরে এসেছে কিনা আমার জানা নেই। ওল্ড টেস্টামেন্টে বুনো গাধার কথাও বহুবার আছে যারা হল সত্যিকারের দুর্লভ প্রাণী। এই তো সেদিন একরকম বুনো গাধা দেখতেই উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সৌরাষ্ট্রে গেছলেন। শুনেছি তিব্বতে হিমালয়ে আর সৌরাষ্ট্রে এদের কিছু অবশিষ্ট এখনও আছে।

গোটা গ্রীস উপদ্বীপে সাধারণ মানুষ একসময় গাধায় চড়ে খুবই বেড়াত । চারিদিকে নলখাগড়ার বন, পাহাড়ে জমি, সেখানে মাটিতে কান পাতলেই এখনও নাকি শোনা যায় — 'রাজা মাইডাসের কান দুটি গাধার'। গ্রীসের গাধা দেখতে সুন্দর আর তা চড়েও আরাম । তাই ওখানে বেড়াতে গেলে সাঙ্ঘাতিক বড়লোকেরা নাকি হোটেলে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে বেশ কিছুদিন গাধায় চড়েই আয়েস করেন। যাদের পূর্বপুরুষ একদা সক্রেটিসের গাড়ুগামছা বয়েছে, তাদের কৌলীন্যের মাশুল তো বেশ একটু চড়া হবেই। পশ্চিমের বহু শহরে এবং বন্দরেই গাধায় চড়ে বেড়ানোর রেওয়াজ আছে। কানাডার কুইবেকে সেন্ট লরেন্স নদীর ধারে প্লাজায় শুনেছি গাধার এক্কা প্রচুর দেখা যায়। আর অভিজাত ট্যুরিস্টদের সেটাও অন্যতম আকর্ষণ । রোমান যুগে সেনাবাহিনীর সঙ্গে, শস্যখেতের চাষির সঙ্গে এবং পথেঘাটে ভারবাহী গাধার কথা সাহিত্যে পাওয়া যায়। সে যুগের একখানি বিচিত্র বই হল — আপুলেইউসের 'গোল্ডেন অ্যাস' । এতে পালাপার্বণ, জাদু, উপকথা, মন্তরতন্তর, কামশাস্ত্র, অভিশাপ, দেবীর কৃপা, শাপমুক্তি, কী না আছে এবং তার সঙ্গে একটি প্রচণ্ড জ্যান্ত গাধাও আছে । 'গোল্ডেন অ্যাসের' একটি ফ্রেস্‌কো প্যারিসে ল্যুভ্‌র্ মিউজিয়মে আছে। সম্রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রা এবং সীজারের মহিষীরা সে যুগে যে গাধার দুধে স্নান করতেন তা অনেকে সিনেমায় দেখে থাকবেন (স্মরণীয় : 'সাইন অব দি ক্রস')। প্রসাধন ছাড়াও মধ্যযুগ জুড়েই তুকতাকের ব্যাপারে গাধা ও গাধার দুধের একটা স্থান ছিল। সেকালে তীর্থক্ষেত্রের দরগায় নাকি এমন সব পীর সাহেব থাকতেন যাঁরা গাধার দুধ দিয়ে চোখ ধুয়ে ফেলে ভূত-ভবিষ্যৎ সব বলতে পারতেন। পঞ্চাশ বছর আগে দেখেছি বালেশ্বরী বামুন ঠাকুরেরা গাধার দুধে আলোচাল পাক করে মহাপ্রসাদ জাতীয় একটি বস্তু তয়ের করত আর ঠাকুমা-দিদিমারা সেটি খাওয়াতেন বসন্ত রোগের প্রতিষেধক হিসেবে। ফর্সা রঙের দিকে কলকাতার গিন্নিদের সেকালে এক অস্বাভাবিক ঝোঁক ছিল। তখন গন্ধকের জলে গাধার দুধ মিশিয়ে একটি অত্যাশ্চর্য রূপটানের চল ছিল বলে আমার জানা আছে। দ্বাদশ শতকে ফ্রান্সের অতিখ্যাত বেউয়ু নকশি কাঁথাতে একটি চমৎকার গাধার ছবি পশম দিয়ে বোনা হয়েছে । চসার এবং বোকাচ্চিও দুজনের লেখাতেই গাধায় চড়ে এদেশে ওদেশে পাড়ি দেবার কথা বিস্তর আছে। কৌতুকের প্রসঙ্গ ডেকামেরনেই বেশি। যেমন : টাসকানির এক ধূর্ত পাদ্রি পশু-কল্যাণের নামে গোটা গাঁ থেকে মোটা বার্ষিকী আদায় করতেন । গরিব চাষিরা সেন্ট অ্যান্টনির কাছে গোরু-গাধার জন্যে পুজো মানত করত । গাধার নামে সিন্নি চড়ানোর কথা ভাবতেও আমার খুব ভালো লাগে। ফ্লোরেন্সের শহরতলিতে সুন্দরী তৈস্‌সার সঙ্গে তার প্রেমিক ফ্রেডারিগোর এক বিশেষ ধরনের বলাকওয়া ছিল। সুন্দরীর আঙুরবাগানে

কাঠের খুঁটিতে একটা গাধার মাথা টাঙানো থাকত । ফ্লোরেন্সের দিকে গাধার মুখ ঘোরানো থাকলে ফ্রেডারিগো নির্ভয়ে সে বাড়িতে ঢুকতেন আর ফিওজোলে শহরের দিকে মুখটা থাকলে বুঝতে হত যে তেস্‌সার স্বামী বাড়ি আছেন। দ্রাক্ষাকুঞ্জে সঙ্কেতবটের কোলে হেলে দুলে গাধার মাথাটি দিব্যি কাকও তাড়াত আর বঁধুকেও নিশানা দিত। সারভান্টিসের অমর কাহিনী তো ছেলেবুড়ো সকলেরই। ডন কুইক্‌সোট্ আর সাঙ্কো পাঞ্জাকে কে না ভালোবাসেন ? ওই গল্পে নাইটের আরাধ্যা দেবী তো 'জ্যোৎস্না রাতে মাতাল সমীরণ' পেলেই সঙ্গিনীদের নিয়ে গাধায় চড়ে ঘুরতেন । আর সাঙ্কোর ঘোড়া না থাকলেও ছিল সাত আদরের সোনা গাধা ড্যাপ্‌ল্। সাঙ্কো যে উদার ও মহৎ ছিলেন তা ড্যাপলের সঙ্গে আমরাও বলি।

প্রভু যীশুর গাধায় চড়ে আবির্ভাবের কথাটা ভক্ত পাদ্রিরা সর্বদা স্মরণে রাখতেন। ভিক্তর হিউগোর 'লে মিজারেবল' উপন্যাসের শুরুতেই বিশপ মিরিয়েলের গাধায় চড়ার কথা আছে। বিশপকে গাধা থেকে নামতে দেখে যখন লর্ড মেয়র লজ্জিত হলেন এবং শহরের বাসিন্দেরা হাসাহাসি করতে শুরু করলে তখন তিনি বেশ কড়া সুরেই পশুরাজ্যে গাধার অসাধারণ গৌরবের কথা ঘোষণা করেছিলেন। 'মিডসামার নাইট্‌স্ ড্রিমে' ওবেরন, টাইটানিয়া, পাক আর গাধা নিয়ে শেক্‌স্‌পিয়র যে কৌতুক দৃশ্যের অবতারণা করেছেন সেটিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় । রেনেসাঁস যুগের শিল্পীরা গাধার পিঠে মা মেরীকে অনেকেই এঁকেছেন, সেরা ছবিখানি বোধহয় জিয়োত্তোর। ঈস্টারের সময় যীশুর পুনরুত্থানের অপূর্ব ঘোষণা করেছিল চেস্টারটনের সেই গাধা নিজেই —

There was a shout about my ears,
And palms before my feet.

এছাড়া গাধার ওপরে লেখা হেরিক, কলাম, ওয়াল্টার ডি লা মেয়ারের ভালো কবিতা আছে । স্পেনের কবি হিমেনেথের কবিতাও খুব ভালো বলে শুনেছি ।

রবার্ট লুই স্টিভেনসন একবার খুব অশান্ত আর কাতর মন নিয়ে ফ্রান্সে যাত্রা করেন। গ্রামের পথে পথে ঘুরবেন বলে প্রথমেই তিনি নগদ পঁয়ষট্টি ফ্রাঙ্ক এবং ভালো ব্র্যান্ডি দিয়ে একটি সুন্দরী গাধা কিনলেন। গাধার নাম ছিল মডেস্টিন (নামটি কি স্টিভেনসনের দেওয়া ?)। বারো দিন ধরে এই গাধায় চড়ে অবিশ্রান্ত ঘুরে তিনি যা সঞ্চয় করেছিলেন তারই ফসল হল — 'ট্র্যাভেল্‌স্ উইথ এ ডংকি'। মডেস্টিন তার মনিবকে খুব ভক্তি করত এবং তাঁর হাত থেকে প্রথমে সাদা ও পরে ব্রাউন রুটি খেতে শিখেছিল। মডেস্টিনকে ছেড়ে আসার সময় স্টিভেনসন বন্ধুবিচ্ছেদের বেদনা আবার নতুন করে

অনুভব করেন। শিল্পী ওয়াল্টার ক্রেন স্টিভেনসন আর মডেস্টিনের যে ছবি আঁকেন সেটি এখন ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে সুরক্ষিত।

বারট্রান্ড রাসেলও তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে অল্প বয়েসে গাধায় চড়ে বেড়াতে তিনি খুব ভালোবাসতেন। তাঁর গাধাটিরও বেশ বুদ্ধিসুদ্ধি ছিল, সে নাক দিয়ে বন্ধ দরজা খুলতে পারত ইত্যাদি ইত্যাদি। নব বসন্তে একবার সস্ত্রীক গ্রীসে বেড়াতে গিয়ে রাসেলের চোখে সেখানকার গাধাদেরও খুব তৃপ্ত বলে মনে হয়েছিল।

পশুকে ভালোবাসা পশ্চিম জগতের খুব সহজ একটি চেতনা। তাই শুধু ঈশপের কথামালা কেন, সে ছাড়াও অনেক অনেক বিলিতি শিশুপাঠ্য বইতেই গাধাকে নিয়ে বিস্তর গল্প-সল্প আছে। বিখ্যাত ফোটোগ্রাফার সিসিল বিটনের 'ইনডিয়া অ্যালবাম'-এ তাই গাধার ছবি দেখে আমরা চমকে উঠি না। ব্রাইনার জোন্‌স্‌-এর 'লাইভ্‌স্টক্‌' বইটিতে গাধার সচিত্র বিবরণ অংশটুকু অসাধারণ যত্ন নিয়ে লেখা। আফ্রিকার ডোরাদার গাধা যে জেব্রারই ছোটো ভাই, স্পেনের গাধারা যে বেশ সুপুরুষ, মিশরের কোনো কোনো গাধা যে প্রায় পুরোপুরি সাদা — এই ধরনের রকমারি খোঁজখবরে সে বইটি ভরা। এই সুদর্শন সাদা গাধারই একটি দুষ্প্রাপ্য ছবি সার কেনেথ ক্লার্কের 'অ্যানিমাল্‌জ্‌ অ্যান্ড ম্যান্‌' বইটির মলাট জুড়ে সগৌরবে বিরাজ করছে।

বাইবেলের প্রাণবন্ত প্রাচুর্যের পর গাধার প্রসঙ্গে কোরানকে দেখা যায় আশ্চর্যরকমের নিঃশব্দ। সেখানে শুধু একবার মাত্র তার কর্কশতম স্বরের উল্লেখ আছে। অবিশ্যি ধর্মগ্রন্থ ছেড়ে সাহিত্যজগতে এলে এই খেদের বেশ খানিকটা মিটে যায়। প্রথমেই ধরুন দশম শতকের আরব্য উপন্যাসের কথা। সেখানে জেলের জালে হয় মরা গাধা, নয় কলসি ভরা দৈত্য হরদম উঠতে দেখা যায়। তারপর বাগদাদ শহরের সেই রুটিওয়ালার কথা ভাবুন — পিঠেয় মরিচ দেয়নি বলে যাকে গাধার পিঠে চড়িয়ে শহর ঘোরানো হয়েছিল। এমন নইলে একাধিক সহস্র রজনীর নেশা! আবার দেখুন আলিবাবা যে চল্লিশ চোরের গুপ্তধনের ভাঁড়ার সাফ করতে পেরেছিলেন সে তাঁর রত্ন হেন গুণসাগর তিনটি গাধা ছিল বলেই না! যারা দূর বন থেকে ভারী কাঠের বোঝা, মোহরের ছালা, দাদা কাসেমের চৌফালি করা লাশ সবই মুখ বুঁজে বয়ে আনত — তাই না অমন গল্পখানি পৃথিবীতে আদপে লেখা হতে পেরেছিল। কিন্তু আলিবাবা যে কৃতজ্ঞ হয়ে ওই গাধাদের দানাপানির সুবন্দোবস্ত করেছিলেন এমন কথা কিন্তু বার্টন সাহেবের অত বড়ো বইতেও কোথাও লেখা নেই। চোদ্দ শতকের মোল্লা নাসিরউদ্দীনের গাধা-প্রীতির কথা গল্পরসিকেরা সবাই জানেন। মোল্লা নিজের বিবির চেয়েও গাধাকে

ভালোবাসতেন, কাউকে ধার দিতে পছন্দ করতেন না, আবার গাধা চুরিও করতেন, হাটেও বেচতেন, সবই অম্লানবদনে কবুল করে গেছেন । সংস্কৃত 'শুকসপ্ততি' বইটির মধ্যপ্রাচ্য সংস্করণ হল 'তুতিনামা' । সম্প্রতি ক্লিভল্যান্ড মিউজিয়ম থেকে এর একটি ঝকঝকে সচিত্র সংস্করণ বেরিয়েছে আর তাতে সংগীতবিশারদ গাধার রঙিন ছবিটি দেখবার পর আমি মরিয়া হয়ে বইটি শেষ পর্যন্ত কিনতে বাধ্য হয়েছি । পারস্যের কবি জামী-র 'হফ্‌ত আওরঙ্গে'র উৎকৃষ্ট চিত্রিত সংস্করণ আছে তাতে শিল্পী মির্জা আলির 'রুগ্‌ণ গাধা বিক্রি'র ছবিটি দেখার মতো। স্টুয়ার্ট কেরী ওয়েলচের সম্প্রতি প্রকাশিত বইতে এই ছবি দেখা যাবে। সম্রাট জাহাঙ্গীরের ভুবনমোহন চিত্রশালায় নেহাৎ মনোহর, দৌলত কি বিষণদাস না হোক একটু পরের ধাপের কোনো না কোনো শিল্পী গাধার ছবি নিশ্চয় এঁকেছেন — এমনি দুরাশা আমার মনে ছিল । 'তুজুকে' আছে আফ্রিকা থেকে সদ্য আনা জেব্রাকে দেখে প্রথমে বাদশার মনে হয়েছিল ওটি বুনো গাধা বা 'গুর্‌খর' এবং খুব ভুলও হয়নি প্রাণিতত্ত্বের দিক থেকে । জেব্রার চোখের কাজলরেখা যে সম্রাটকে কীরকম মুগ্ধ করে ফেলেছিল তার বর্ণনা 'তুজুকেই' পাবেন । আশা করি মনসুরের আঁকা ছবিটি অনেকেরই দেখা । মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে গল্প বা ভ্রমণকাহিনী যাই লেখা হোক না কেন গাধা তাতে থাকেই । পাউস্তোভস্কির যেন কোন একটা লেখা এইভাবে শুরু হয়েছিল — ইস্তানবুলের রাস্তা, গলায় টর্চ বাঁধা গাধা একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে । আহা নিঃসঙ্গ বেচারা !

আমাদের প্রাচীনতম সাহিত্য অর্থাৎ ঋগ্বেদে গাধার উল্লেখ একাধিক । সে অশ্বিনীকুমারের বাহন, যজ্ঞশালার একপাশে বাঁধা থাকে । তাকে বিপদে রক্ষা করার জন্যে ঋষি অগ্নির কাছে প্রার্থনা করেন। আয়ুর্বেদসংহিতায় গাধার মাংস আর দুধের গুণাগুণের ফিরিস্তি দেওয়া আছে। লৌকিক সাহিত্যে এদিক ওদিক ছড়ানো ছোটানো উদ্ভট শ্লোকে তার চারিত্রিক গুণের কথাও আছে । জাতকের গল্পের জগতে সর্বদাই নানা পশুর মেলা, সেখানে গাধাও আছে । ধম্মপদের ব্যাখ্যাপুস্তক হল অট্‌ঠকথা, সেখানে গাধার প্রেম নিয়ে দু-চার ছত্রের মজাদার পদ্যও আছে । সম্রাট অশোকের খরোষ্ঠী লিপি যা ডান দিক থেকে বাঁ দিকে লেখা হত, তার সঙ্গে গাধার ঠোঁটের সাদৃশ্য এতদিন কল্পনা করা হত । এখন ওই মতটি বাতিল হওয়ায় বেচারা গাধার মানটুকু গেছে ।

সেকালে দলিলপত্র লেখা হত প্রধানত গাধার চামড়ায় । তাই সেগুলোকে অনেকদিন পর্যন্ত বলা হত 'খর্‌পুস্ত' । পঞ্চতন্ত্রের সব গল্পেই পশুপাখির সঙ্গে মানুষের গভীর অন্তরঙ্গতা । তার গাধার গল্পেও সেই সুর কাটেনি — তার ঘাস খাওয়া, মার খাওয়া, চরে বেড়ানো, প্রেম করা সব গল্পই সরস । তবে 'মৃচ্ছকটিকে' শূদ্রক বলেছেন যে,

বিদগ্ধ লোক আর গাধা এক জায়গায় থাকতে পারে না । বাণভট্টের 'হর্ষচরিতে' দেখা যায় সম্রাটের সেনাবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে গাধারা মাল বইছে আর সহিস 'বল্লনে'রা তাদের তাড়া দিতে দিতে চলেছে — ছবিটি ভালো । বাণের শ্বশুর কবি ময়ূরভট্ট ছিলেন খুব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি । কিন্তু কেন যে তিনি গাধার মিলন নিয়ে অমন কবিতা লিখতে গেলেন তা বোঝা মুশকিল, সম্ভবত ওটি উদ্দেশ্যমূলক রচনা । উনিশ শতকের বাঙলা সাহিত্যে হরিমোহন রায় যে 'গাধাবলী' বা পদ্যসংগ্রহ লেখেন সেও ছিল এমনি উদ্দেশ্যমূলক । তাই তার গাধারা কেউ পশু নয় সব সামাজিক মানুষ । বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকরহস্য'-এর গর্দভ — একটি অসামান্য রচনা — শাণিত শ্লেষে তার সর্বাঙ্গ ঝলমল করছে ।

যাই হোক বুদ্ধিহীনতার জন্যে তিরস্কৃত হওয়া ছাড়াও এদেশে গাধা যে কীভাবে অশুভ শক্তির প্রতীক হয়ে দাঁড়াল তা আলোচনার বিষয় । মহাভারতে আছে, দুর্যোধনের জন্মের সময় চারিদিক থেকে গাধা ডেকে উঠল, বিজ্ঞেরা বললেন, পৃথিবী ধ্বংস হবে । গুপ্ত ভাস্কর্যের একটি বিচিত্র নির্দশনে দেখা যায়, সীতাহরণের সময় রাবণের মাথায় গাধার মূর্তি । এই কুসংস্কার কতদিন চলেছিল ঠিক বলা না গেলেও, আঠারো শতকে মেবারশৈলীর সীতাহরণের ছবিতেও রাবণের মাথায় গাধার মুকুট দেখা যায় । সন্দেহভঞ্জনের জন্যে শিবরামমূর্তি সম্পাদিত এবং ন্যাশনাল মিউজিয়ম প্রকাশিত 'বার্ড্‌স্ অ্যান্ড্ অ্যানিমাল্‌জ্ ইন ইনডিয়ান স্কাল্‌প্‌চার' বইটি দেখা যেতে পারে।

বিকানীর রাজ্যে কার্‌ণি দেবীর মন্দিরে শুনেছি ইঁদুর নিয়ে এলাহি কাণ্ডকারখানা । ইঁদুর মাত্রই সেখানে পবিত্র এবং সুরক্ষিত । আমরা ইঁদুরকে হিংসে করিনে আর গাধার পুজোও চাইনে । অবিশ্যি মা শেতলার বাহন হিসেবে তার মাটির শরীরটা এদেশে একবার পুজো পায় । আমরা শুধু তার চরিত্রহননের জন্যে দুঃখপ্রকাশ করতে পারি মাত্র।

সন্দেহ নেই ভারতবর্ষ অতি পবিত্র দেশ । কিন্তু এর সাধুসন্ত, শিল্পী, সাহিত্যিকেরা কেউ কখনও গাধার কথা ভেবেছেন বলে জানা নেই । তবু যা হোক নন্দলাল আর যামিনী রায়ের দুখানা ছবি আছে তাই রক্ষে । আচ্ছা, ভেবে দেখুন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যখন মহাপ্রস্থানে গেলেন তখন সেই হিমালয়ের পথে একটি বুনো গাধা তাঁর সঙ্গ নিলে তো কোনোও ক্ষতি ছিল না — কিন্তু তা তো ঘটেনি। সন্ত্ কবীরের বক্‌রি নিয়ে গল্প আছে । আচ্ছা কবীরজীর আশ্রমে গাধাও তো ছিল । বঙ্গভূমির বারোদীতে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর আশ্রমের পাশে ছোট্ট সুন্দর নদীটির নাম ছিল 'ছাগল-বাঘিনী' । গাধাকে নিয়ে কোনো নদীর নাম রাখার কথা আমরা ভাবতেই পারিনে । তাই আমাদের ভাঁড়ারে দেখা যায় —

অষ্টরম্ভা

গাধাকুড়, গাধার টুপি, গাধা পেটাপিটি, গর্দভ রাগিণী এই সব বাজে শব্দ । বাঙলা সাহিত্যে ছাগলকে নিয়ে পরশুরামের 'লম্বকর্ণ', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'মোটবারো', রামপদ মুখোপাধ্যায়ের 'অদৃশ্য সুতো' এবং আরো অনেক গল্প আছে । হিন্দী লেখক নিরালার 'বিল্লেসুর বক্‌রিহা' বড়ো উপন্যাস । ভৈকম মহম্মদ বশীরের 'পাতুম্মার ছাগল' নানা ভাষায় অনূদিত হয়ে খ্যাতি অর্জন করেছে। আবার বলছি ছাগলের সঙ্গে আমার কোনো বিবাদ নেই বরং 'বালসখিত্ব' তার সঙ্গেও ছিল । আমি চাইছিলুম ক্রস লিস্ট থেকে গাধার নাম বাদ দিতে, তা হল না । হ্যাঁ, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের একটি গল্প আছে বটে কিন্তু তাতে গাধার ওপর ভালোবাসার ছিটেফোঁটাও নেই । শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' না হোক, কোনো কাঞ্চনমালার 'রসির ডায়েরি'ও গাধাকে নিয়ে নেই । ছেলেবেলায় বিলেতের রাজারাণীর জীবনী আমাদের পড়তে হত । কবে কোন মাংসওয়ালা রাজকুমারী মেরীকে দুটি ছাগল আর একটি টানবার গাড়ি উপহার দিয়েছিল তার নামও মুখস্থ ছিল — হায় রে ! কিষান চন্দরের এক গাধার কাহিনী ব্যঙ্গরচনা, ঠিক গাধার কথা নয় । বিদ্যাসাগর মশাই এক জায়গায় ঈশ্বরবন্দনা করতে গিয়ে বলেছেন — 'জগদ্ ভাণ্ড কুলাল' অর্থাৎ সেই অলৌকিক কুম্ভকার যিনি শত শত জগদ্‌ঘট গড়ছেন আর ভাঙছেন । পৃথিবীর তুচ্ছ মাটির ঘট ভাঙাগড়ার কাজে 'সহচরিত অনিয়ত অনুষঙ্গ' হয়ে কুলালের কাছাকাছি যে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে সে আমার বাল্যবন্ধু কুদর্শন বুদ্ধিহীন গর্দভ । আপাতত এইটুকু মাত্র জেনেই আমার তৃপ্তি ।

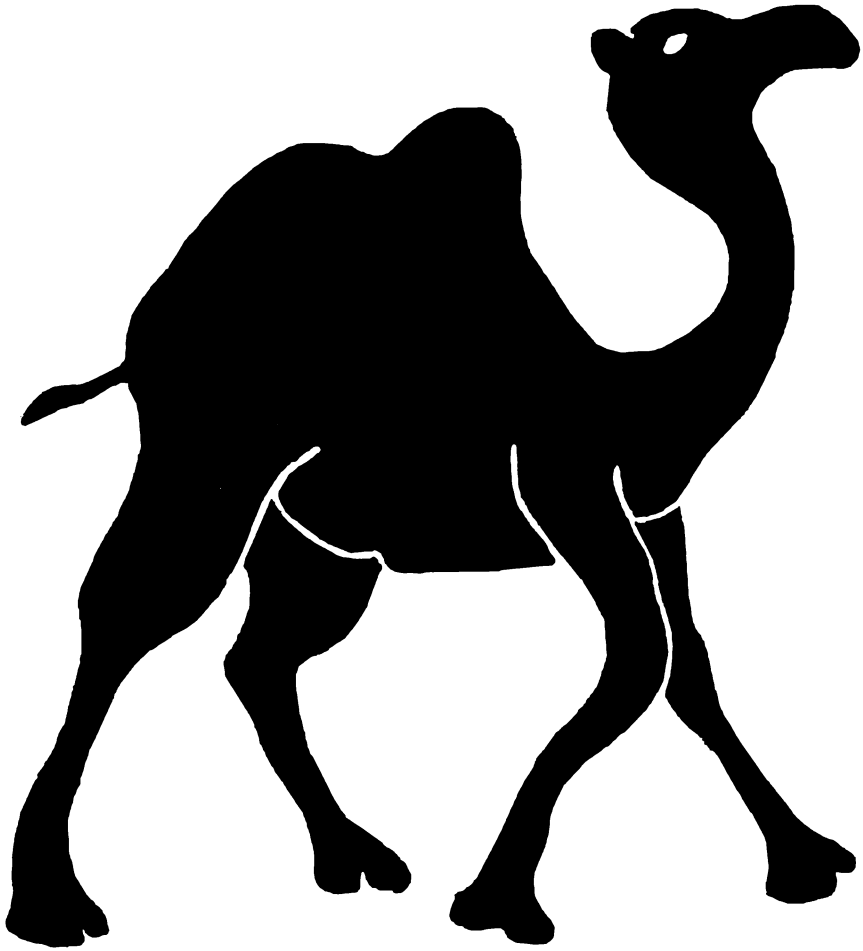

উষ্ট্রকথা

একদা বর্ণপরিচয়ের অনেক আগেই বাঙালি শিশুরা আবৃত্তি করতে শিখত — 'উট চলেছে মুখটি তুলে।' 'হাসিখুশি'র ছবিতে লম্বা গলা উটের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটত বোধ করি বছর তিনেক বয়সে । তারপর বড়োদের হাত ধরে চিড়িয়াখানায় গিয়ে একদিন শুভক্ষণে কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহ জীবটির সাক্ষাৎ মিলত । পৃথিবীর সমস্ত মরু এবং অর্ধমরু অঞ্চলে যুগ যুগ ধরে উটই ছিল জীবের এবং সভ্যতার বাহন। আলেকজান্ডার, চেঙ্গিস খান, তৈমুর লঙ্, বাবর, নাদির শাহ — মোট কথা শক হুনদল পাঠান মোগল — সকলেরই দিগ্বিজয়ের মূলে আছে অস্ত্র, খাদ্য এবং রসদবাহী এই উটের দল। এয়ার কন্ডিশন্ড গাড়িতে এখন মানুষ সাহারা পার হচ্ছে — তাই জাহাজ কিংবা মালগাড়ি বললেও সে যুগে সেই ভয়াবহ জনশূন্য তৃণহীন প্রান্তরে অসামান্য কষ্টসহিষ্ণু উটেদের অপরিহার্যতার কিছুই বোঝানো যাবে না।

উত্তর আফ্রিকা, আরব, পারস্য, তুর্কীস্তান আর ভারতবর্ষে উটেদের কুঁজ একটা। এরা দ্রুতগামী এবং যাত্রিবাহী (ক্যামেলাস ড্রমিডারিয়াস)। শুধু মঙ্গোলিয়া অঞ্চলে উটেদের কুঁজ দুটো, সাধারণত তারা ভারবাহী (ক্যামেলাস ব্যাক্ট্রিয়ানাস)। এই দু-কুঁজওয়ালা লোমশ উট আমরা দেখিনি । জুওলজিকাল সোসাইটি ১৯৭৫ সালে যে শতবার্ষিকী স্মারক পত্রিকা বের করেছেন তাতে দু-কুঁজ কেন, এক-কুঁজওয়ালা উটও যে কোনোদিন আলিপুরে ছিল, তার কোনই উল্লেখ নেই। ১৮৫০ সালে 'শিশুশিক্ষা' তৃতীয় ভাগে মদনমোহন তর্কালঙ্কার অসাধারণ সুললিত বাঙলায় উট সম্বন্ধে প্রথম লেখেন। জে. লসন তারপর ১৮৫২ সালে তাঁর 'পশ্বাবলী' বা 'অ্যানিম্যাল বায়োগ্রাফি' প্রকাশ করেন। বইটি

সচিত্র — বাঁ দিকে ঝরঝরে ইংরিজি, ডান দিকে স্বচ্ছন্দ বাঙলা। আখ্যাপত্রে উটের ছবির নীচে একটি পদ্য —

ক্ষুধা তৃষ্ণা সহে উষ্ট্র অতি উপকারী।
মরুভূমি রূপ সিন্ধু তরিবার তরী॥

বিবরণের শেষে উটের বুদ্ধি নিয়ে নানারকম গল্পের একটি সংগ্রহও তিনি দিয়েছেন।

বাঙলায় 'প্রাণিবিদ্যা' লিখতে গিয়ে ১৮৬১ সালে তারকব্রহ্ম গুপ্ত 'রোমন্থী উট' নিয়ে খানিকটা লিখেছিলেন। পরের বছরই ১৮৬২ সালে গিরিশচন্দ্র তর্কালঙ্কার 'বিবিধ জুওলজি গ্রন্থ' থেকে সংগ্রহ করে একটি ভালো বই লেখেন। উড্রো সাহেব আর রাজেন্দ্রলাল মিত্র বইটি দেখে দেন, ব্যাপ্‌টিস্ট মিশন বই ছাপায়। এতে দ্বিককুদ ক্রমেলকের কাঠখোদাই ছবিও আছে। তারপর ১৮৭৮ সালে লোহারাম শিরোরত্নের ভাগ্নে দামোদর মুখোপাধ্যায় উটের দুখানি ছবি দিয়ে একটি সাত আট পাতার প্রবন্ধ তাঁর 'পাঠমালা' তৃতীয় খণ্ডে লেখেন। বেদুইনেরা নাকি ময়দা আর উটের দুধের দই দিয়ে 'আয়েব' বলে এক সুখাদ্য তৈরি করে, উটের দুধ থেকে দই পায়েস বা আয়েব গায়েব — এসব খবর দামোদর কোথা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন বলেননি।

ল্যাটিন প্রবাদে আছে — উট শিঙ চেয়েছিল, পেল না, উলটে তার কানও গেল। সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকও এক কথাই বলে — সত্যি না হলেও। উটের ঘ্রাণ ও শ্রবণশক্তি তো আছেই, তাছাড়া তার ইন্দ্রিয়ের বোধ অতি প্রবল যা দিয়ে দেড় মাইল দূর থেকেও সে জলের আভাস পায়। সে সহজেই পাঁচ-সাতদিন জল না খেয়ে থাকতে পারে। হঠাৎ জলের ধারে এসে সে ইচ্ছেমতো দশ পনেরো বিশ গ্যালন এমনকী আরও বেশি জল খেয়ে নিতে পারে। মরুভূমির বাসিন্দারা উটের দুধ ও মাংস খেত আর তার জিভটা নুন মাখিয়ে কিংবা ধোঁয়া দিয়ে ভাপিয়ে নিয়ে সুখাদ্য হিসেবে চালান দিত। উটের চামড়ায় ভালো জুতো, থলি, টুপি ইত্যাদি হয়। চর্বি থেকে তেল, লোম থেকে দামি গরম কাপড়, কম্বল ও কার্পেট হয়। চীনদেশে সেকালে লেখার ও ছবি আঁকার বিভিন্ন তুলি উটের লোম দিয়েই হত। উটের বিষ্ঠা শুধু জ্বালানির জন্যে নয় ওষুধ তৈরির কাজেও লাগত।

উটকে শেখানো পড়ানোটা খুব ঝামেলার ব্যাপার। কারণ সে খুব মেজাজি এবং খেয়ালিও বটে। তাকে দীর্ঘ দিন ধরে বহু যত্ন করে শুধু উঠতে আর বসতে শেখানো হয়। ডগলাস স্লেডেনের টিউনিসিয়া ভ্রমণে পড়েছিলুম যে সেখানে বেড়াতে গিয়ে উটের চিত্তচমৎকারী ওঠাবসা দেখে তাঁর মনে হয়েছিল — এরা যেন স্কটল্যান্ডের পার্লামেন্ট মেম্বার। তাঁরা যেমন ধীরে সুস্থে অনেক তরিবত করে দুই বুড়ো আঙুল ওয়েস্টকোটের

পকেটে ঢুকিয়ে তবে বক্তৃতা করতে ওঠেন, উটেরাও নাকি অবিকল সেইরকম ভঙ্গি সহকারে উঠে দাঁড়ায় (বলা বাহুল্য স্লেডেন ইংরেজ, দেখুন, কোথায় লাগে এর কাছে ঘটি-বাঙালের ঝগড়া!) । সেকালে আরবদেশের সর্দারেরা এই কাজটি খুব ভালো জানতেন।তাই তাঁরা দলে দলে অগুন্তি উট নিয়ে অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে চলাফেরা, ব্যবসাবাণিজ্য, লুটপাট, হানাহানি সবই করতে পারতেন। উটকে ইশারা করে বসতে শেখানো, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার পিঠে একটু একটু করে প্রচণ্ড ভারী মাল তুলে দেওয়া, ইচ্ছেমতো খাবার ও জল বন্ধ করে দিয়ে তাকে উপোসের অভ্যাস করানো, এ সবই ছিল রীতিমতো শিক্ষা ও সময়সাপেক্ষ । সহিসেরা অনেক সময় ভারী বোঝা পিঠে চাপিয়ে অকারণে উটকে বসিয়ে রাখে। বসে থেকে থেকে তাদের বুকে আর হাঁটুতে কড়া পড়ে যায়। উটের পিঠে যে বিরাট ভারী বোঝা থাকে তা হঠাৎ একেবারে তুলে নিলে উটেরা নানাভাবে বিপন্ন হতে পারে। এইজন্যে মাল খালাসের কাজটি বিচক্ষণ ব্যক্তিরা যথেষ্ট সময় নিয়ে করে থাকেন। মাল নামিয়ে বেল্ট লাগাম ইত্যাদি খুলে নেবার পর উটেরা নিঃশব্দে বালির ওপর গড়াগড়ি দিয়ে নেয় ও পরে যত ইচ্ছে জল খায়। বিরক্ত হলে উট একটু আধটু ঢুঁ মারে। সাধারণত সে রাগে না। তবে তার রাগ ভয়ংকর এবং কামড় বিষাক্ত। রাগি উট তার সামনের মানুষকে দাঁতে করে তুলে ছিঁড়ে ফেলে দেয়, কখনও বা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে কিংবা পায়ের নীচে থেঁতলে পিষে মারে।

বড়ো বড়ো যুদ্ধের ডেসপ্যাচ আর ডায়েরিতে ট্রান্সপোর্ট ক্যামেলের কথা আছে। ম্যাক্‌মিলানের 'অ্যানিম্যাল হিরোজ্ অব দ্য গ্রেট ওঅর' গ্রন্থে আর্নেস্ট বেন লিখেছিলেন, প্রথম মহাযুদ্ধে জেনারেল অ্যালেনবির অধীন পঞ্চাশ হাজার উট ছিল। বিভিন্ন পরিবেশে ওইসব ভারবাহীদের জন্যে রকমারি ব্যবস্থা ছিল — যেমন জাহাজে চালান দেবার সময় ডেকের ওপর বালি ঢালা হত, কারণ উটেরা নাকি শক্ত কাঠে শুতে বসতে পছন্দ করে না। বর্ষা তাদের সহ্য হয় না, জলে বেশিক্ষণ পা ডুবিয়ে রাখলে তাদের পায়ের দোষ হয় — এমনিধারা সাতসতেরো। মোট কথা বিদেশে তাদের অতি সহজেই নানা রোগ ধরে। রোগ হলে তাদের পায়ের লোম খসে যায়, আর দলে দলে তারা মারা পড়ে। আফগান যুদ্ধের সময়ে ডাক্তার ওষুধ হাসপাতাল সব থাকা সত্ত্বেও ইংরেজ পক্ষে হাজার হাজার উট মারা পড়ে। 'বাবরনামা'য় মড়কের সময় রুগ্‌ণ উটেদের যে করুণ ছবিটি আছে সেটি এ প্রসঙ্গে অবশ্য স্মরণীয়। শুনেছি অ্যারিস্‌টট্‌ল লিখেছিলেন — জলের ধারে এসে উটেরা প্রথমে পা ডুবিয়ে তার পরে সেই ঘোলা জল খায়। কিন্তু এ যুগে সেই অভ্যাস তাদের এখনও আছে বলে জানা নেই। কর্নেল জয় সিং 'ক্যামেল রাইড্ ইন থার'-এ রাজস্থানী যাত্রাপথের এক সুন্দর বর্ণনা দিয়েছিলেন। ক্যারাভানের সঙ্গে থাকত খোলা

তরোয়াল বা বন্দুক হাতে একজন রাজপুত সর্দার। নর্তকী, সরেস তামাক, উত্তম পানীয়, মাদল, সানাই সব নিয়ে মরুভূমিতে তখন রাত্রেই পথ চলা হত। হায় রে, বাঁশিওয়ালার পিছু পিছু সেসব দিন আজ উধাও। যদিচ জয়শল্‌মীর ও বিকানীরে আজও বিস্তর উটওয়ালা — হিন্দুরা রঙিন আর মুসলমানেরা পরেন সাদা পাগড়ি। জয়শল্‌মীরের চারিপাশে তিরিশ চল্লিশ মাইল পথ সমস্ত দিন ধরে যদৃচ্ছায় ঘুরে বেড়ালেও টাকা চল্লিশের মধ্যেই হয়ে যায়। রাজস্থানে এখন উটের সংখ্যা ঠিক কত তা বলা না গেলেও 'সিনেমা ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল' পত্রিকার সাহায্যে জানা যায় যে সত্যজিৎ রায়মশাই 'সোনার কেল্লা' ছবি তৈরির সময়ে জয়শল্‌মীর মহারাজার সাহায্যে সহজেই এক হাজার উট সংগ্রহ করেছিলেন। বিকানীরে আছে শ-খানেক বছরের বেশি পুরোনো ক্যামেল ব্রিডিং হাউস। উটের এক্কা এবং মালটানা গাড়ি এখানে পথে সর্বত্র দেখা যায়।

মেজর চীসম্যান-এর 'আন্‌নোন অ্যারেবিয়া' থেকে খোশখবরের একটু আধটু নমুনা দেখা যাক — যেমন অনেকের জানা নেই যে উটেদের মাথায় প্রায়ই বিস্তর উকুন বা এঁটুলি জাতীয় পোকা থাকে। বেদুইনরা চীসম্যানকে বলেছিল ওই সব উকুন হল রহমান খোদার মেহেরবানীর দান। কারণ মাথায় পোকার জ্বালায় উটেদের তেজ কম থাকে বলেই তারা পোষ মানে। চীসম্যান স্বচক্ষে দেখেছিলেন উটের পিঠের ঘায়ে সহিসেরা রসালো পাকা খেজুর থেঁতলে পুলটিস লাগিয়ে দেয়। বাচ্চা উটের যেমন আদর তেমনি নামের বাহার — একবছরের কচির নাম 'হাওয়ার', দু-বছরের 'মাকরুদ', তিনে 'হেজী', চারে 'লেজী', পাঁচ বছরের বাচ্চার নাম 'থেনী'। থেনীদের দুধে দাঁত 'রুবা' খসে গিয়ে আসল বা পাকা দাঁত গজায়। মোট কথা উটের মহিমা আর নানারকম খ্যাপামিও চীসম্যান খুব ফলাও করে লিখে গেছেন।

যে উট তার জীবদ্দশায় আর মৃত্যুর পরেও মানুষের এত কাজে লাগে মানুষ কিন্তু তাকে বড়োই অবহেলা করে এসেছে। রবীন্দ্রনাথের 'ছড়া ও ছবি'তে সামরু যেমন তার গাই সুধিয়াকে, কিংবা শরৎচন্দ্রের গফুর যেমন তার মহেশকে ভালোবাসত, অসম গৌরীপুরের লালজী (প্রকৃতীশচন্দ্র বড়ুয়া) যেমন তাঁর হাতি প্রতাপসিংকে ভালোবাসতেন উটওয়ালাদের কেউ কেউ হয়তো তাদের জীবন আর জীবিকার সঙ্গে জড়ানো উটকে তেমনই ভালোবাসে, কিন্তু সেই ভালোবাসার নির্দশন কোনো গল্প কিংবা কবিতায় খুঁজে পাওয়াই দায়। ডেলাক্রোয়ার 'ঝড়ের মুখে ঘোড়া'র ছবিটি বোধহয় সবাই দেখেছেন। মরুভূমিতে বিপন্ন উটের তেমন ছবি কেন নেই, এর কোনো জবাব আছে কি ? সমগ্র কোরানে মাত্র চার পাঁচ বার উট শব্দটির উল্লেখ আছে। ব্রাউন কিংবা আরবেরী সাহেবের ফারসি কবিতার বিশ্ববন্দিত সংকলনগুলিতে উটের ওপর কোনো কবিতাই

নেই । 'পেঙ্গুইন বুক অভ অ্যানিম্যাল ভার্স' এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব । সার কেনেথ ক্লার্কের 'অ্যানিম্যালস্ অ্যান্ড মেন'-এ উট নেই । মিলড্রেড আর্চারের 'ন্যাচারাল হিস্ট্রি ড্রয়িংস ইন দি ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি' বইটিতেও উট নেই। আরব্য উপন্যাসে উটে চড়ে দুনিয়া ভ্রমণের কথা থাকলেও কোনো গল্পেই উট প্রধান হয়ে দেখা দেয়নি। শেক্স্পিয়রের বিস্তীর্ণ রচনাবলিতে ক্যামেল শব্দটির বার দুই উল্লেখ মাত্র আছে। অথচ ডি. এইচ. লরেন্স ছোট্ট মশার ওপরেও তো বড়ো কবিতা লিখেছেন । এদিকে বিদ্‌ঘুটে চেহারার জন্যেই হয়তো উটের কিঞ্চিৎ সমাদরও ছিল। তার প্রমাণ বিলেতের কোট অব পাবলিক আর্মসের কোষগ্রন্থ । গত শতাব্দীর শেষে এডিনবরা থেকে ফক্স ডেভিস এবং ক্রুক্স্ মিলে যুক্তরাজ্যের সমস্ত অভিজাত বংশের পারিবারিক বিশিষ্ট প্রতীক (হেরালডিক্ মোটিফ) একত্র করে এই অভিধান জাতীয় গ্রন্থে প্রকাশ করেন । সেখানে 'হ্যান্‌লে' এবং 'ক্যামেলফোর্ড' বংশের প্রতীক দু-কুঁজওয়ালা উটের দুই ছবি পাওয়া যায়।

মনে হয় বিদেশি সাহিত্যের তুলনায় বাঙালি পাঠ্যপুস্তকলেখকেরা মোটামুটি সহৃদয় ছিলেন। ছেলেবেলায় পড়া কোনো নীতিশিক্ষা থেকে খানিকটা পদ্য তুলে দিচ্ছি —

তৃণভোজী উষ্ট্রে করে কত উপকার

নাইবা থাকিল তার রূপের বাহার
পৃষ্ঠে কুঁজ উদরেতে জল রাখে জমা
ক্লান্তি নাই চলে পথ বিচিত্র মহিমা
যখন মরুর পথে ঝড় ছুটে আসে
প্রভুই উষ্ট্রের রূপে দয়া করে দাসে
অবিশ্রাম চলে পথ শীত গ্রীষ্ম নাই
কাঁটা সার ঘাস খায় রক্ত পড়ে তাই
চামড়ায় বনে জুতা লোমেতে কম্বল
দুধ খায় মাংস খায় পালকের দল ।

এই লেখকের নাম স্মরণ করবার ভার পাঠকের ওপর ছেড়ে দিলুম।

কোরানে যেমন উটের কথা মোটে না থাকার মতো, বাইবেলে তেমনি পাতায় পাতায় উট । ধনী মানুষের সম্পত্তির মধ্যে উটের গণনা তখন অবশ্যকর্তব্য ছিল । বুক অব্ জাজেস-এ আছে সমুদ্রের বালি যেমন গোনা গাঁথা যায় না, মিডিয়ানদের উটও তেমনি সংখ্যাহীন। লেবীয় পুস্তকে উটের মাংস খেতে বারবার নিষেধ করা হয়েছে । ইসমাইলি ব্যবসায়ীরা উটের পিঠে রাশি রাশি ধূপধুনো অগুরুচন্দন, গুগ্‌গুল আর গন্ধরস নিয়ে

তখন বারে বারে মিশরে যেতেন । না জানি কত ছিল তাদের ওজন আর কী অপূর্ব ছিল সুগন্ধ ! পাঠকের জন্যে একটিমাত্র উটের প্রসঙ্গ তুলে দিই জেনেসিস থেকে — আব্রাহাম তাঁর ছেলে আইজাকের বউ খোঁজবার জন্যে নাহোর নগরে এক বিশ্বস্ত দাসকে দশটি উট আর নানা যৌতুক দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন । ভর সন্ধেবেলা সেদেশে পৌঁছে তারা সব কুয়োতলায় হাজির হল । ঠিক সেইসময়ে সুন্দরী রেবেকা এলেন কলসি কাঁধে জল নিতে । আব্রাহামের কথা মতো সেই দাস (বইতে যাঁর কোনোও নাম নেই) দৌড়ে গিয়ে জল খেতে চাইলেন — রেবেকা তাঁর তৃষ্ণা মেটালেন, উপরন্তু উটেদেরও জল খাওয়ালেন । ঠিক তারপরই উক্ত ব্যক্তি রেবেকার নাকে আধ তোলা সোনার নথ এবং হাতে দশ তোলা সোনার বালা পরিয়ে দিলেন । তারপর রেবেকার পিতৃপরিচয় জেনে নিয়ে ওই ব্যক্তি তাদের বাড়ি গেলেন । সেখানে উটেদের খড় আর কলাই খাইয়ে কর্তার ছেলের সঙ্গে রেবেকার বিয়ের কথা পাকা করে ফেললেন । গহনা আর দশটি উট বোঝাই যাবতীয় যৌতুক ভাবী কুটুমদের দিয়ে দিলেন । দেখুন একবার উটকে জল খাওয়ানোর কেমন হাতে হাতে ফল ! নিউ টেস্টামেন্ট থেকে তুলে দিই একটি জগদ্বিখ্যাত উক্তি : ' ঈশ্বরের রাজ্যে ধনীর প্রবেশের চেয়ে বরং ছুঁচের গর্ত দিয়ে উটের যাতায়াত সহজ ।' মিশর দেশের সর্বত্র উটের বিচরণ কিন্তু তার প্রাচীন ছবিতে উট নেই। তবে পণ্ডিতেরা বলেন সেখানে গৃহপালিত পশুর মধ্যে সম্ভবত উটও ছিল (দ্র. পেঙ্গুইন প্রকাশিত 'আর্কাইক ইজিপ্ট') । অ্যাসিরীয়ান যোদ্ধারা বহু যাযাবর জাতিকে ধ্বংস করেছিলেন । উটে চড়ে তীর ছুঁড়ে ইলামাইটেরা অ্যাসিরীয়ানদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন । এই যুদ্ধের সম্পূর্ণ 'বাস রিলিফ'-টি ব্রিটিশ মিউজিয়মে আছে । অ্যাসিরীয়ার নিনেভে শহরের বিখ্যাত নিমরুদ ফলকের দুপিঠে ব্যাক্‌ট্রিয়ার উটের ছবি আছে । খ্রি. পূ. ১৩ শতকে ফিনিসীয়ানদের তৈরি একটি নিখুঁত ব্রোঞ্জমূর্তি আধুনিক সিরিয়া থেকে পাওয়া গেছে, উটের আদিমতম এই মূর্তির ছবিটি ডেভিসের পৃথিবীর ইতিহাসে (অক্সফোর্ড) আছে । চীন দেশের শানটুং অঞ্চলে সমাধির দেওয়ালে উটের শোভাযাত্রার ভালো ছবি আছে (খ্রি. পূ. দ্বিতীয় শতক)। মধ্যযুগে নোয়ার জাহাজ আর জলপ্লাবন নিয়ে যেসব ছবি আঁকা হয়েছিল, তাতে উটের ছবি প্রচুর । চতুর্দশ শতকে তৈরি ইটালির অর্‌ভিয়েতো গির্জায় একটি সুন্দর মূর্তি আছে যেখানে ঈশ্বর হাতের ইশারায় সিংহ উট গাধা ভেড়াদের সৃষ্টি করছেন । ষোড়শ শতকে জীবতত্ত্ববিদ ও চিকিৎসাবিজ্ঞানী আল্‌দ্রোভান্‌দির বইতে দু-জাতের উটের দুই প্রকাণ্ড ছবি আছে । উইলি লে তাঁর 'ডন অব্ জুঅলজি'তে সম্প্রতি পরম সমাদরে ওই ছবিদুটি পুনর্মুদ্রিত করেছেন । সোভিয়েত পণ্ডিত ভাসিলি ইয়ান তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস 'চেঙ্গিস খানে' মোঙ্গোলিয়ার উটের অজস্র বর্ণনা

দিয়েছেন । গলায় মস্ত ঘন্টা বাজিয়ে বাজিয়ে ক্যারাভানের সঙ্গে তারা হরদম চলেছে ।

ভারতবর্ষে ঋগ্বেদে যুদ্ধের প্রয়োজনে এবং বাহক হিসেবেও উটের উল্লেখ পাই । ধনীরা উট-দানও করতেন। বাজসনেয়ী এবং তৈত্তিরীয় সংহিতায় কোনো কোনো মতে উট-বলির কথাও আছে । আয়ুর্বেদসংহিতায় যথারীতি উটের মাংস ও দুধের গুণ বর্ণনা আছে । মহাভারতে শান্তিপর্বে একটি উটের গল্প আছে — প্রকাণ্ড এক অলস উটকে দুর্বুদ্ধি শেয়াল কীভাবে খেয়ে ফেলল, সেই কথা । পঞ্চতন্ত্রের চার-পাঁচটি গল্পে এবং হিতোপদেশে একটি উটের গল্প আছে । পঞ্চতন্ত্রে উটের দুটি নাম পাচ্ছি — ক্রথনক আর শঙ্কুকর্ণ । জাতকের কোথাও উটের গল্প নেই । কৌটিল্যর অর্থশাস্ত্রে উটের কথা অসংখ্য বার । প্রথমেই নজরে আসে তার দৈনিক খাদ্যতালিকা দুই দ্রোর্ণ (ছোট কলসি) মাষ, প্রচুর তিলের খোসা আর যত ইচ্ছে ভুষি। 'নাসাবেধ' করবার পর কিছু দিন তাকে বেশি খাদ্য ছাড়াও ভাতের মাড়, নুন, তেল, সামান্য মাংস আর একটু মদও দেওয়া হত । নাসাবেধ প্রসঙ্গে বলা ভালো উটের নাকে নিয়মিত তেল দেবার কথা আইন-ই-আকবরীতেও ঠিক এইরকম ভাবে আছে । যুদ্ধের সময় চলন্ত বাহিনীর সঙ্গে বিষবিদ্যাপটু চিকিৎসক থাকতেন। কারণ উটেরা সাপের কামড়ে প্রায় মারা যেত । উটের সাজ হিসাবে তখন মুখবন্ধনী রশি ও হার থাকত । কেশকার তার লোম ছাঁটাই করত, তাকে সাজাবার, বেঁধে রাখবার, খেতে দেবার এবং সর্বদা দেখাশুনা করবার আলাদা আলাদা লোক থাকত । উট মারা গেলে তার চামড়া এবং ল্যাজটা গবাধ্যক্ষের কাছে জমা দেবার নিয়ম ছিল । পতঞ্জলির মহাভাষ্যে (খ্রি. পূ. দ্বিতীয় শতক) উটের নানা কথা রয়েছে । তার হাওদার নাম উষ্ট্রকট, ছবির নাম উষ্ট্রপট, উষ্ট্রজিহ্বা তখনও সুখাদ্য, তার কুঁজের গড়নের মাটির কুঁজোটির নাম উষ্ট্রিকা । অভিধানে উটের নাম হল উষ্ট্র, ক্রমেল(ক), করভ(ক), ময় আর মহাঙ্গ । ক্রমেল শব্দের সঙ্গে ক্যামেল শব্দের কোনো সম্বন্ধ আছে কিনা তা ভাষাবিজ্ঞানীরা জানেন । উষ্ট্র শব্দের বানান কী হবে গল্প আছে তাই নিয়ে । বিয়ের রাতে বিদূষী ভার্যার কাছে কালিদাসকে অপদস্থ হতে হয়েছিল — 'উষ্ট্রে লুম্পতি রং বা ষং বা' অর্থাৎ উষ্ট্র না উট্র । রাজকন্যার বিদ্রূপবিদ্ধ কালিদাস গেলেন তপস্যা করতে । সিদ্ধিলাভের পর নিজের কাব্যগুলির অর্থাৎ কুমারসম্ভব, মেঘদূত, রঘুবংশ আর ঋতুসংহারের প্রথম শব্দ পর পর সাজিয়ে স্ত্রীকে এসে বললেন — 'অস্তি কশ্চিৎ বাগ্‌বিশেষঃ' — অমনই শুরু হয়ে গেল তাঁর প্রতিষ্ঠা ।

এখন এসব গালগল্প আমাদের রুচিতে পছন্দ না হলেও গল্পগুলো কিছু বেশ পুরোনো। হ্যাঁ, কালিদাস পরে তাঁর রঘুবংশে উষ্ট্র শব্দের ব্যবহার করেছেন । বাণভট্ট তাঁর হর্ষচরিতে সেনাবাহিনীর দণ্ডযাত্রাপ্রসঙ্গেও চলন্ত উটের কথা বলেছেন । উদ্ভট

শ্লোকাবলীর সার হল — 'করভস্য আশুগত্যৈব ছাদিতা দোষসংহতিঃ' — অর্থাৎ দ্রুত গতির গুণেই তার বেঢপ শরীরের সব দোষ ঢেকে যায় । প্রবাদসংগ্রহেও উটের প্রসঙ্গ একাধিকবার পাওয়া যায় । একটি ভারী সুন্দর যেমন : 'উষ্ট্র কন্টক ভক্ষণন্যায়' — যখন মুখে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে তখনও জিভের আস্বাদন পাওয়া, অর্থাৎ সুখদুঃখের সমকালীন অনুভূতি । প্রাচীন ভারতের ভাস্কর্যে বা চিত্রকলায় কোথাও উটকে দেখতে পাইনি । তবে কোনারকের মন্দিরের গায়ে যখন আফ্রিকার জিরাফকে দেখা গেছে তখন খুঁজলে দিশি উটকেও হয়তো পাওয়া যেতে পারে ।

মধ্যযুগে ভারতীয় প্রেমকাব্যের অমরকাহিনী হল 'ঢোলা মারু রা দুহা' । ঢোলা ছিলেন নারওয়ার রাজ্যের কুমার আর নায়িকা মারু পুগলের রাজকুমারী। পুষ্করতীর্থে বেড়াতে গিয়ে তাদের বাবা মা তিন বছরের বরের সঙ্গে দেড় বছরের কনের বিয়ে দিলেন । দেশে ফিরে শ্বশুর পুত্রবধূর কথা ভুলে গিয়ে ছেলে ঢোলার আবার বিয়ে দিলেন রাজকুমারী মালবনীর সঙ্গে । মালবনীর চক্রান্তে মারু আর কিছুতেই স্বামীর ঘরে আসতে পারেন না । মারুর কান্নাই হল রাজস্থানী বারমাস্যা আর মারু রাগিণী । এই কাব্যের চতুর্থ চরিত্র হল ঢোলার উট । তার একশোর বেশি ছবি আছে কিন্তু একটিও ডাকনাম নেই — কেন ? জয়শল্‌মীরের কাছে লোদ্রবয়ে 'মুমল মহেন্দ্র' উপাখ্যানে যে উটের কথা শোনা যায় তার তো নাম আছে, তার নাম 'চীখল'। সে হিসেবে ঢোলার উটের দীঘল নাম হওয়া খুবই উচিত ছিল কিন্তু উচিতের চেয়ে অনুচিতের প্রতাপই তো বেশি, তাই এমন কাণ্ড ! সে যাক গে — এই নামহীন উটই মালিকের সঙ্গে কথা বলত, গান গাইত আর ফন্দি আঁটত। তার বুদ্ধিতেই শেষ পর্যন্ত ঢোলা মারুর মিলন ঘটল। উটে চড়ে নায়ক-নায়িকার ঘরে ফেরার ঝলমলে ছবিই হল ঢোলা মারু চিত্রমালার শেষ ছবি। যোধপুরে সর্দার মিউজিয়মে এই সিরিজের সবগুলি ছবি ছিল বলে শোনা ছিল। ভারতীয় ডাকবিভাগ ১৯৭৩ সালে 'লাভার্স অন্ ক্যামেলব্যাক' নাম দিয়ে এক টাকা দামের যে রঙিন ডাকটিকিট বের করেন তার মূল ছবিটি গোপীকিসন কানোরিয়ার ব্যক্তিগত সংগ্রহে আছে। ঢোলা মারু রাজস্থানি ডিঙ্গল ভাষায় লেখা। মূলের সঙ্গে হিন্দী অনুবাদ দিয়ে এ বই কাশী নাগরী প্রচারণী সভা বের করেন। এই কাব্যটি সম্রাট আকবরের অত্যন্ত প্রিয় ছিল ; সে হিসেবে ষোলো শতকেই এই গাথাকাব্য বর্তমান আকার ধারণ করেছিল বলা হয় । রাজস্থানের দিক্‌পাল ঐতিহাসিক ম. ম. পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর ওঝা আজমীর শহরে ঢোলা মারুর জলুস বা শোভাযাত্রা দেখেছিলেন। ড. কালিকারঞ্জন কানুনগো এই কাব্য এবং এর ঐতিহাসিকতা দুই নিয়ে বিস্তর লিখেছেন। কাঁকরোলী দ্বারকানাথ মন্দির থেকে প্রভুদাস পাটোয়ারী 'ডিভাইন ফ্লুটিস্ট' নামে গুজরাট রাজস্থান

ও মালব দেশের ছবি আর তার আলোচনা বের করেছেন। এতে 'গুর্জরী রাগিণী' একটি অসামান্য উজ্জ্বল ছবি। হাতে হাতির দাঁতের কাঁকন, পায়ে মল, কানে সোনার ফুল আর লাল চোলি পরা নায়িকাকে নিয়ে তার প্রেমিক সুসজ্জিত উটে চড়ে পালিয়ে যাচ্ছেন; ছবির তারিখ সতেরো শতক ।

এখনও রাজস্থানের সর্বত্র উট । উট সওয়ার নিয়ে ঘোরে, মাল টানে, এক্কা টানে। যখন তার বাচ্চারা সঙ্গে সঙ্গে যায় তখন বড়ো চমৎকার লাগে দেখতে । শহরে ও গ্রামে বড়ো বড়ো মেলায় উট বিক্রি হয় বলে শোনা আছে । আজমীর শহরের এক উটওয়ালার সঙ্গে একদা আমার বন্ধুত্ব ছিল, তাঁর নাম টিড্ডী, শহরে যেবার পঙ্গপাল নেমেছিল সেই সালে তাঁর জন্ম । তিনি রাজস্থানী বাঁধনির রঙিন থান দিয়ে বিশাল পাগড়ি বাঁধতেন । তাঁর সঙ্গে দুবার আমার দেখা হয়েছিল — দুবারই শেক্‌স্‌পিয়রের ভাষায় তিনি ডিড্ নাথিং বাট্ টক অভ হিজ ক্যামেল্‌জ্ । উট সম্বন্ধে নানা গল্প ছড়া ও প্রবাদ তাঁর মুখে শুনেছি । মরুভূমির ঝড়ে নাকি উটকে ভাঙ খেতে দেওয়া হত, তখন উটেরা ঝিমিয়ে পড়ে, নইলে উলটোপালটা ছোটাছুটি করে তারা ভীষণ বিপন্ন হয়, হারিয়েও যায় । টিড্ডী নিজেকে বলতেন 'শুতুরবন্' বা 'অল্ জমাল' আর উটকে বলতেন উঁট । বিকানীরের উটেরা খুব তেজি আর বাকিরা সব 'অল্‌সী' । জয়শল্‌মীরের উটের সাজসজ্জা খুব চটকদার । যে সাজ খানিকটা আপনারা সত্যজিৎ রায়ের 'সোনার কেল্লা' ছবিতে দেখেছেন । টিড্ডীর মুখে শোনা একটি দোঁহা হল —

মারওয়ার নর নিপজে নারী জয়শল্‌মীর ।
সিন্ধা তুরাহী সান্ত্রা করহল বিকানীর ॥

অর্থাৎ মারওয়াড়ের পুরুষ, জয়শল্‌মীরের নারী, সিন্ধু দেশের ঘোড়া আর বিকানীরের উট — এদের জুড়ি নেই । উটের গলায় ঘন্টা ছাড়া রকমারি মালা, ঝুঁটিতে তাজ, রেশম পুঁতি, জরি ও কাঁচ বসানো হাওদা, নানারঙের দড়ি ও থোপ্‌না, ফুলকারি চাদর, এসবের আলাদা আলাদা রাজস্থানি নাম আছে । ওদেশে শারদীয়া এবং বাসন্তী শুক্লা অষ্টমী তিথিতে রাজবাড়িতে 'গঙ্গৌর' উৎসবে হাতি আর ঘোড়ার পুজো হত । সেই দুদিন শহরের উটওয়ালারাও নিজের নিজের উটকে একটুখানি উৎকৃষ্ট রাজস্থানি মদ খাওয়াতেন ।

মধ্যযুগের উটের ছবি নিয়ে এবার অতি সামান্য একটু বলি । আরব দেশের চিত্রশিল্পে ইয়াহিয়া ওয়াসিতি একটি প্রসিদ্ধ নাম । বাগদাদ শহরে বসে আল হরিরির 'মোকামত' বইটি থেকে তিনি শতাধিক ছবি আঁকেন । গল্পের নায়ক আবু জাইদের এবং মেলাই উটের ছবি এতে আছে । উট ছাড়া যে আরব দেশে চলত না এটি হাউসেনের

'অ্যারাব পেন্টিংস' দেখলে বিলক্ষণ বোঝা যায় । পারসীয়ান মিনিয়েচারেও উটের ছবি বেশ কিছু । বেসিল গ্রে, উইলকিন্‌সন্‌, রবিন্‌সন্‌, লরেন্স বিনিয়ন ইত্যাদি যে কোনো পণ্ডিত সমঝদারের সম্পাদিত বই দেখলেই চলবে । নিজামীর খাম্‌সার ছবিতেও আছে পথে উটের লড়াই চলছে, আর বিশীর্ণ মজনু সেইদিকে করুণ চোখে তাকিয়ে আছেন । আকবর বাদশার অতুলনীয় কীর্তি হল হাম্‌জানামার ছবি আঁকানো । ভিয়েনা এবং ভিকটোরিয়া ও অ্যালবার্ট মিউজিয়ম থেকে যে অ্যালবাম বেরিয়েছে উটের একাধিক এবং উৎকৃষ্ট ছবি তাতে আছে । মোগল যুগে 'বাবরনামা' এবং 'আকবরনামা'র চিত্রিত সংস্করণ (যথাক্রমে রণধাওয়া ও গীতি সেনের বই) দেখা যেতে পারে । এই সব শিল্পীদের নাম মিশ্‌কিন, অমল পারস, আর খেমকরণ । জাহাঙ্গীরের যুগে উটের লড়াইয়ের বিখ্যাত ছবিটি অজ্ঞাতনামা চিত্রকরের আঁকা । তবে কার্ল খান্ডেলওয়ালা বলেন এ ছবির শিল্পী সম্ভবত নন্‌হা । এটি এখন বম্বের প্রিন্স অব্‌ ওয়েলস্‌ মিউজিয়মে আছে । মধ্য এশিয়া ও ভারতবর্ষে পশুপাখির লড়াইয়ের চল বহুদিনের । উর্দু লেখক আবদুল হালিম শরার-এর বইতে 'গুজিশ্‌তা' অর্থাৎ পুরোনো লখনউয়ের উটের লড়াই-এর বীভৎস বর্ণনা আছে ।

কোম্পানির আমলে উটের প্রথম ছবিটি সম্ভবত ১৭৯০ সালে জর্জ ফ্যারিংটনের আঁকা । এর প্রতিলিপি মিলড্রেড আর্চারের ব্রিটিশ পোর্ট্রেট্‌সে আছে । বকর্‌ঈদের দিন মুরশিদাবাদের নবাব হাতি আর উট নিয়ে শোভাযাত্রা করে মসজিদে যাচ্ছেন । ১৭৮৫ থেকে বছর দশেক ভারতবর্ষে থাকতে থাকতে টমাস এবং উইলিয়ম ড্যানিয়েল খুড়ো ভাইপো যেসব ছবি আঁকেন তাতে তেলরঙে আঁকা উটের প্রকাণ্ড ছবি আছে তিনখানি । প্রথম ১৮০৪ সালে টমাসের আঁকা 'কুয়োতলায় উট'। তাঁরই অন্য ছবিতে মিনারের পাশে যাত্রীদের তাঁবু, আর উটের পিঠে দুই বিরাট মাদল । এটি এখন ভিক্‌টোরিয়া মেমোরিয়ালে আছে । তৃতীয়টি উইলিয়মের আঁকা 'ডাকহরকরা উট' । লন্ডন থেকে ১৮৪৪ সালে শ্রীমতী এমিলি ইডেনের বই বেরোয় 'দ্য প্রিন্সেজ অ্যান্ড পিপ্‌ল অব্‌ ইন্ডিয়া'। লর্ড অক্‌ল্যান্ডের বোন শ্রীমতী ইডেনের ভ্রমণের বিচিত্র ইতিহাস হয়তো অনেকের জানা নেই । তখন রেলপথের কল্পনাও ছিল না । অসাধারণ শারীরিক ক্লেশ করে ভদ্রমহিলা কলকাতা থেকে সিমলা, সিমলা থেকে লাহোর এদিক ওদিক আড়াই বছর ধরে ঘুরে ব্যারাকপুর লাটবাগানে ফেরেন । পথে কখনও নৌকো আর বজরা, কখনও হাতি ঘোড়া বা উটের পিঠে চড়েছেন আর দুচোখ ভরে দেখেছেন । এঁর কিছু ছবি নিয়ে ভিকটোরিয়া মেমোরিয়লে ১৯৭২ সালে একটি প্রদর্শনী হয়েছিল । মিউটিনির পর ১৮৫৮ সালে অ্যাট্‌কিনসন লিথোগ্রাফে উট এঁকেছিলেন — সেখানে স্যর কলিন

ক্যামবেল সদলবলে ফৈজাবাদ যাচ্ছেন । কোম্পানির আমলের দীর্ঘ যুগ পরে এল ১৯১২/১৩ সালে আঁকা অবনীন্দ্রনাথের 'শেষ যাত্রা' । ছবিটি যেমন বর্ণাঢ্য তেমনি করুণ। এরপর নজরে আসার মতো ছবি হল — অমৃতা শেরগিলের ১৯৪১ সালে আঁকা তিনটি উট ।

উট তার দীর্ঘাতিদীর্ঘ শরীর নিয়েও বাঙলা সাহিত্যে এক আধবার নাক গলিয়েছে মাত্র, তাঁবু দখল করতে পারেনি । প্রথম বাঙালি সাহিত্যিক যিনি স্বয়ং উটে চড়ে সিন্ধু উপত্যকা, ডেরাইসমাইলখাঁ, রাওয়ালপিণ্ডি ইত্যাদি ভ্রমণের বর্ণনা দেন, তিনি নববিধান সমাজের প্রচারক সাধু অঘোরনাথ । তাঁর চিঠিপত্রের তারিখ বাঙলা সন ১২৮৫ থেকে ৮৬ । ইকমিক কুকার খ্যাত ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক মিশরে গিয়ে উটের চলাফেরা বুদ্ধিসুদ্ধি আর বাঁশির সুরে সাড়া দেওয়া দেখে যে চমৎকৃত হয়েছিলেন তা তাঁর 'বিলাত ভ্রমণ' পড়লেই বোঝা যায় । এর পর প্রায় চল্লিশ বছর পরে রবীন্দ্রনাথের ছড়ায় পেলুম যে উটের কামড় খেয়ে কাবুলের সর্দারের হাঁটুটা বিলকুল লোকসান হয়ে যায়। আর সেই থেকে নাকি বাজারে আখরোট খোবানির দাম বেড়ে যায়। অবধূতের 'মরুতীর্থ হিংলাজ'-এর উট রীতিমতো জ্যান্ত। যাত্রীরা তার পিঠে মাল চাপিয়ে করাচী থেকে তীর্থযাত্রা করেন। অবধূতের ভৈরবী নিজের উটের নাম রেখেছিলেন উর্বশী। সৌভাগ্যবান সেই উট মরুভূমির পথেও রোজ রুটি, খেজুর, কিসমিস খেতে পেত। মারাঠি লেখক রামকৃষ্ণ খাম্বেটের একটি চমৎকার উটের গল্প অনুবাদে পড়েছি, অন্য ভাষার কথা জানা নেই।

প্রসঙ্গ শেষ করার আগে খেলনায় উটের কথা একটু বলি । লর্ড কর্নওয়ালিসের সময় যখন কর্ণাটক যুদ্ধে টিপু সুলতান হেরে গেলেন ঠিক তার পরেই মহীশূরের শিল্পীরা হাতির দাঁত দিয়ে দাবার ঘুঁটি কয়েক প্রস্থ তৈরি করেন। টিপুর বাহিনীতে শিল্পীরা অতি সুন্দর হাতি ও উট গড়েছিলেন । এই ঘুঁটির একটি সেট ভিকটোরিয়া অ্যালবার্ট মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। রলিনসন তাঁর 'কনসাইস হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া'তে এই ঘুঁটির ছবি দিয়েছেন। সেযুগে রামনগরের রাজবাড়িতে কাশীনরেশের খেলনাঘর যাঁরা দেখেছেন তাঁদের হয়তো হাতির দাঁতের উট-খেলনার কথা মনে আছে। মারাঠা যুগের কথায় ভরা বলবন্ত রাও পারসনীশের 'পুনা ইন বাইগন ডেজ' একটি বিখ্যাত বই। এতে পেশোয়াদের চিড়িয়াখানার জন্তু-জানোয়ারদের অতিসুন্দর মাটির মূর্তির ছবি আছে। অবিকল কেষ্টনগরের পুতুলের মতো, তবে এগুলো কোনো কুমোরের তৈরি নয়। ড. সুরেন্দ্রনাথ সেন লিখেছেন যে ইংরেজ দূত স্যর চার্লস ম্যালেটের জন্যে কোনো ব্রাহ্মণ শিল্পী এগুলি তৈরি করেছেন। ম্যালেট লিখেছেন — পেশোয়ার চিড়িয়াখানায় একটি দু-কুঁজওয়ালা লোমশ উটও ছিল, সে আবার পুরোপুরি সাদা। আগ্রার সেকেন্দ্রায় কাঠের

রঙিন হাতি ও উট পাওয়া যেত । খুব ছোট্ট কিন্তু ভারি সুন্দর। কাশীর বিশ্বনাথের গলিতেও কাঠের রঙিন উট দেখেছি। জয়পুরে, উদয়পুরে লাল সবুজ মীনা করা পেতলের উট এখন আবার খুব চালু হয়েছে। এই উজ্জ্বল মীনার খেলনা ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় বিলেতের প্রর্দশনীতে দেখিয়ে প্রশংসা অর্জন করেছিলেন (তাঁর 'ভিজিট টু ইয়োরোপ' দ্রষ্টব্য)।

খুব ছোটবেলায় গিরীন্দ্রশেখর বসুর কন্যা দুর্গাবতীর 'পশ্চিম যাত্রিকী' পড়েছিলুম। তিনি লিখেছিলেন যাঁরা মিশরের পিরামিড দেখতে আসেন সবাই উটে চড়ে ছবি তোলেন। ভাবতুম বড়ো হলে আমিও পিরামিড দেখব আর উটে চড়ে ছবি তোলাব। হল না, 'ঢোলামারু'র ভাষায় 'ভুঁই ভারী ঘর দূরী' রয়ে গেল। ঠাকুর রামকৃষ্ণ মানুষের সংসারের আসক্তির সঙ্গে উটের কাঁটা ঘাস চিবোনোর উপমা দিয়েছেন। কিন্তু সেই কাঁটা আছে বলেই না ঘাস এত মিষ্টি, আর সেই কাঁটা ঘাস খায় বলেই তো উটকে আমরা কেউ কেউ ভালোবাসি ।

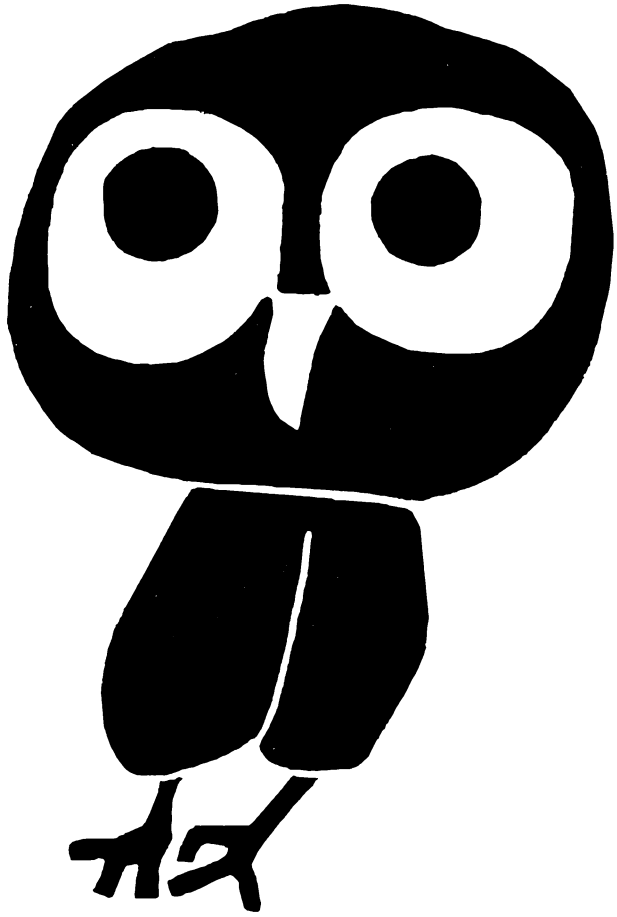

প্যাঁচার পাঁচালি

বেশ মনে পড়ে ছেলেবেলায় আমার সঙ্গী নন্তু লড়াইয়ে হেরে গেলেই মুখের সামনে হাত নেড়ে নেড়ে এই বলে আমায় খ্যাপাত — 'তার উপরে মুখের গঠন/অনেকটা ঠিক প্যাঁচার মতন।' কী দুঃখের কথা, আমি আহাম্মকের মতো ভাবতুম এ অপূর্ব দুটি ছত্র নন্তুরই উদ্ভাবন, কেননা সে খুব মুখে মুখে ছড়া বানাতে পারত। আরো আশ্চর্য এই যে আমি সুকুমার রায় মোটেই পড়িনি। পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছর আগে, তাঁর কোনো বই বাজারে ছাপা ছিল না। আমাদের কাঁচের আলমারিতে ভালো বইয়ের সঙ্গে 'হ য ব র ল' এবং 'আবোল তাবোল' ছিল শুনেছি। কিন্তু ছোটোরা তাতে হাত দিতে পেত না। মধ্যবিত্ত ঘরে শাসনের বেড়া ছিল ভারি শক্ত, দেবী চৌধুরানীর সাগর বৌয়ের ভাষায় বলতে পারি, সেখানে প্রলোভনের বস্তু 'মাটির আঁবের মতো' তোলাই থাকত, ভোগে লাগত না। যাক্ যা বলছিলাম। উপেন্দ্রকিশোর এবং সুকুমার ছোটোদের মনের মতো অপরূপ অনেক কিছু লিখলেও প্যাঁচাকে কিন্তু শেয়াল পণ্ডিতের মতো আমাদের খেলার সাথী করেননি।

প্রিয়ম্বদা দেবীর সব লেখাই সুন্দর কিন্তু 'প্যাঁচা কেন নিশাচর' লেখাটি তাঁর যুগ্যি নয়। ইদানীং কালে সুকুমার দে সরকারের একটা প্যাঁচার গল্প আছে 'দুই খুনি'। গল্পটা ভালো কিন্তু একটা প্রাণীকে বারেবারেই শুধু শুধু খুনি হিসাবে চিহ্নিত করলে কেন জানি ভালো শোনায় না।

প্যাঁচাকে কে আর কবে নাকের ডগায় দেখেছে, পুরোনো বট অশ্বত্থ কিংবা তেঁতুল গাছের কোটরে সে রাতভর ঘুট্ ঘুট্ করে আর হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে। অন্ধকারে জ্বলজ্বল

করে তার দুই গোল চোখ। পরশুরামের চাটুজ্যে মশাইয়ের দূর থেকে মেমসাহেব দেখার মতো প্যাঁচার সমস্ত খবরাখবরই আমারও সাক্ষাৎ পাওয়া নয়, শোনা। মুখখানি তার মানুষের মতো চ্যাটালো যা অন্য কোনো পাখির নেই, ঠোঁটকেই নাক বলে ভুল হয়, আর গলার আওয়াজ ক্বচিৎ যা শোনা যায় তা মেয়েলি কান্নার মতো। প্রকাণ্ড মুণ্ডুটা, এমনকী নখসুদ্ধ থাবাও উলটো দিকে ঘুরিয়ে নেবার ক্ষমতা তার আছে। ছোট্ট পাঁচ ইঞ্চি থেকে শুরু করে ধেড়ে প্যাঁচারা দেড়-পৌনে দু-ফুট পর্যন্ত হয় । মায়ের পেটে না হোক, ডিমের পেটে যখন সে থাকে বোধ হয় তখন থেকেই শিকারের তালিম পেয়ে দেড় মাস বয়স থেকে পোকামাকড় ধরতে শুরু করে দেয়। বলা ভালো তাদের ডিম সম্পূর্ণ গোল।

প্যাঁচার বয়স বিস্তর । প্রাচীন গ্রীসে তার সমাদর ছিল অসামান্য । তাই গ্রীসের টাকাকড়িতে তাকে বেশ বারকতক দেখা যায়। দেবী অ্যাথেনার সঙ্গে তার উপস্থিতি আমাদের লক্ষ্মী প্যাঁচা ধরনের মোটেই কিন্তু নয়। মিশর গ্রীস কিংবা প্যালেস্টাইনে কোথাও কিন্তু প্যাঁচার সঙ্গে মৃত্যু বা অভিশাপের অনুষঙ্গ নেই। এমনকী নিউ টেস্টামেন্টে পাই প্রভু যীশু বলেছেন — 'আই অ্যাম লাইক দি আউল অফ দ্য ডেজার্ট ।'

আস্তে আস্তে কখন যেন গোটা ইয়োরোপ জুড়ে প্যাঁচা অশুভের প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে গেল। এল বশীকরণ, মারণ, উচাটন ও তুকতাকের খেলা । যাতে প্যাঁচার হৃৎপিণ্ড, পালক ও নখের চলল ব্যাপক ব্যবহার। প্লিনি লিখে গেছেন — প্যাঁচার পা কী-একটা শেকড়ের সঙ্গে পুড়িয়ে নিয়ে সঙ্গে রাখলে সাপে কামড়ায় না। তাছাড়া একাধিক ভবঘুরে বেদে তাঁকে বলেছিল যে, প্যাঁচার হৃৎপিণ্ড যদি কোনো যুবতীর বাঁ হাতের তেলোয় রাখা যায় তবে সে নাকি প্রাণের সব গোপন কথাই গড় গড় করে বলে ফেলে। সৈনিকরা যুদ্ধে যাবার সময় ওই বস্তুটি কবচ করে সঙ্গে নিলে যুদ্ধে জেতা সহজ হয়। মধ্যযুগের অতিলৌকিক কারবারের সচরাচর যেসব ছবি পাই তাতে ডাইনির পাশে আগুন, মড়ার খুলি, শেকড়বাকড়ের সঙ্গে প্রায় সর্বত্রই প্যাঁচার দেখা পাওয়া যায়।

শেক্‌স্‌পিয়রের 'জুলিয়াস সীজার', 'লাভস্ লেবার্‌স্ লস্ট', 'ভীনাস অ্যান্ড অ্যাডোনিসে' প্যাঁচা কিন্তু অশুভ চিৎকার নিয়ে মৃত্যুর দূত হিসাবে এসেছে। 'ম্যাকবেথের' শুরুতে তিন ডাইনি মিলে যে অপরূপ 'গ্রুয়েল' তৈরি করেছিল, তাতেও আছে প্যাঁচার পালকের কথা। কোলরিজ, ডিলান টমাস, ডেভিস, এডোয়ার্ড টমাস, মেরিডিথ ইত্যাদি বহু বহু কবির নাম এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে।

বিলিতি লেখকেরা প্যাঁচার মতো খুনি ও নিষ্ঠুর পাখিকে নিয়েও হালকা ফুরফুরে

মেজাজে খুব খুশি হয়ে এমনভাবে লিখেছেন যে এমন পাখি আর ভূভারতে-ভূমণ্ডলে নেই। সভয়ে বলছি অনেকটা যেন স্যর পি সি রায়ের ছাত্রকে দেওয়া সার্টিফিকেটের মতো। দুটি কবিতা থেকে দুছত্র কবিতা শোনাই —

সুইট সাফোক আউল
উইথ ফেদার্‌স্ লাইক এ লেডি ব্রাইট
দাউ সিঙ্গেস্ট অ্যালোন, সিটিং বাই নাইট . . .

আউল্‌স্ আউল্‌স্ নাথিং বাট্ আউল্‌স্
দ্য মোস্ট ফ্যানট্যাসটিক অফ ফাউল্‌স্ ।

শেষের কবিতাটির নাম 'মাই গ্র্যান্ড পা,' লেখকের দাদু নাকি আবার প্যাঁচা পুষতেন । গ্রে-র এলিজিতে পাই প্যাঁচা চাঁদকে ডেকে বলছে যে বেচারার জ্যোৎস্না ছড়িয়ে দিয়ে কী সর্বনাশই না করা হয়েছে। এই সব কবি বিশ্বাস করতেন যে 'লিস্‌নিং টু আউল্‌স্ কুড মেক দি ওয়ার্ল্ড্ ওয়াইজার ।' এডওয়ার্ড লিয়ার-এর কবিতায় প্যাঁচা নৌকো চড়ে তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে গিটার বাজায়।

ফরাসি কবি বদল্যার অবশ্য প্যাঁচার স্থির অধিষ্ঠানের ছবিতে প্রাজ্ঞ মানুষ মাত্রেরই পক্ষে শিক্ষণীয় এক উপাদান খুঁজে পেয়েছিলেন ।

ইউ গাছের কালো ছায়ার খোপে
বিদেশি কোনো দেবতার মতো
সারিবদ্ধ প্যাঁচার দল
ঘুরিয়ে লাল চক্ষু অবিরল
ফুলকি ছড়ায়। তারা কেবল ভাবে।

আর তা-ই দেখে প্রাজ্ঞ মানুষ শিখবে, তার ক্ষণজীবী জীবনে দুরন্ত বা দুর্দান্ত হবার কোনো অবকাশ নেই।

হেঁড়ে মাথা, না ঘাড় না গলা, দুম্বো শরীর, রাক্ষুসে চোখ, গোমড়া মুখ — তবু তার এই অপরূপ রূপের ছবিই এঁকেছেন কত না বিখ্যাত শিল্পীরা। আলব্রেখট্ ড্যুরারের ছবিটি বোধ করি অনেকেই দেখেছেন। 'অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড'-এ আছে তার ভোজসভায় ডোডো, টিয়া, কাঁকড়া আর ইঁদুরের সঙ্গে প্যাঁচাও ছিল। ভিকটোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়মের একটি ছবিতে আছে ফুটন্ত ম্যাগ্‌নোলিয়ার ডালে ফুলটির পাশে

প্যাঁচা দিব্যি বসে আছে। শুধু যে কবি, পাগল আর প্রেমিকেরা প্যাঁচাকে খোঁজে তা নয়। খোলা মাঠে নানা কারণে যাদের রাত জাগতে হয়, ঘরে শুয়ে রাতের পর রাত যাঁরা অনিদ্রায় ভোগেন তাঁরাও প্যাঁচার ডাক শুনতে চান।

আমাদের ভারতবর্ষে প্যাঁচা যে কী করে মা লক্ষ্মীর বাহন হল তা জানা নেই। লক্ষ্মী দেবী বেদে পুরাণে কথায়-উপকথায় সর্বত্র আছেন, কিন্তু সেখানে প্যাঁচা কই? (প্রাচীন ভাস্কর্যে গজলক্ষ্মী মূর্তি সর্বত্র কিন্তু প্যাঁচা তো নেই) হিন্দুর পূজার্চনা কিংবা আচারের মূল যে বেদে, পুরাণে বা সংহিতায় আছে বলে আমরা মনে করি তা কিন্তু কিছু না ভেবেই। বেদে যে প্যাঁচার কথা আছে সে মোটেই পূজনীয় নয়, অতি ভয়ংকর। ঋগ্‌বেদে এক জায়গায় বলা হয়েছে প্যাঁচা রাক্ষুসির মতো লুকিয়ে থাকে — তার নাম খর্গল। কোনো পুরাণে বা রামায়ণ মহাভারতে উল্লেখ করার মতো প্যাঁচা সম্বন্ধে কিছু নেই। কিন্তু জাতকে আর পঞ্চতন্ত্রের গল্পে আমাদের কৌতূহলের অনেকখানি মেটে। কারণ সেখানে তারা মানুষের সঙ্গে মানুষের মতোই মেলামেশা করে। কেউই তাদের অপয়া বা অলুক্ষুনে বলে না। তাই কৌশিক আর উলূক জাতক পড়ে আমরা বেশ খুশি হই। বাঙলা সাহিত্যে আদি যুগটা হল রূপকথার রাজ্য। মা-ঠাকুমার মুখের গল্পে চড়ুই, প্যাঁচা, ইঁদুর, ব্যাঙ, কাঁকড়া আর শেয়ালের ছড়াছড়ি। একটি মাত্র গল্পের কথা এখানে বলি— সেটি 'ঠাকুমার ঝুলি'তে কলাবতী কন্যের কথা। দুই-রাজপুত্তুর বুদ্ধু আর ভুতুম বাঁদর আর প্যাঁচার বেশে সুপুরির ডোঙায় চড়ে ভেসে যাচ্ছে। তারপর সেই ১৮৫০ সালে 'শিশুশিক্ষা' লিখতে গিয়ে মদনমোহন তর্কালঙ্কার সিংহ, হাতি, বাঘ, ভালুকের পাশে প্যাঁচাকেও যে স্থান দিয়েছিলেন তার কারণ বৈজ্ঞানিক ঝোঁক ছাড়া আর কিছু নয়। পরে এল সাহিত্য জগৎ, সেখানে প্যাঁচার কথাও আমাদের রবীন্দ্রনাথ দিয়ে শুরু করতে হয়। রানী কল্যাণীর দাসী ক্ষীরোর মানসিকের ফর্দটা মনে পড়ছে কি ? সে বলেছিল লক্ষ্মী প্যাঁচা ঘরে এলে তার ডানা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে তাকে সিঁদুর পরাবে আর জলপানে দেবে রোজ আশিটা ইঁদুর। ফর্দ শুনে মা লক্ষ্মী তুষ্ট হয়ে তাকে একটি রাতের জন্যে (হোক সে স্বপ্নে) রানী তো করে দিয়েছিলেন। এও কি কম কথা ! লক্ষ্মী প্যাঁচার উলটো হল কালপ্যাঁচা। সত্যিই তাকে বিকট দেখতে। না চাইলেও আচমকা মনে পড়ে যায় শরৎচন্দ্রের 'অরক্ষণীয়া' গল্প — যেখানে জ্ঞানদার মা অন্তিম শয়নে শুয়ে সীমাহীন দুর্ভাবনায় বলে উঠেছিলেন — 'আমি মেয়ে পেটে ধরেছি যেন কালপ্যাঁচা'।

কথাটা যা বলতে চাই তা এই যে, মানলুম সে কুৎসিত, অন্ধকার আর রাতের পাখি—তবু তার ডাকে কোথায় কী যেন আছে, যা বোঝানোর বাইরে। যে কবিতার মানে পুরো বোঝা যায় না তার ছোপ যেমন মনে গেঁথে থাকে, তেমনি যার ডাক শুনলে

ভয় করে, যাকে চোখে প্রায়ই দেখা যায় না — অথচ নিঃসঙ্গ, নির্জন রাতে যার ডাক শুনতে ইচ্ছে করে, সেই পাখি কি ভোলা যায় ? প্যাঁচাকে নিয়ে ঠাট্টা করার ভরসা ছিল অবনীন্দ্রনাথের — সবাই জানেন । তাঁর 'বুড়ো আংলায়' নানা জাতির কাক, প্যাঁচা, বাবুই, চড়ুইএর মেলা। এখানে প্যাঁচা নিয়ে তুকতাকের ব্যাপারও আছে যা খুব মজাদার।

'লাগ্ লাগ্ পেঁচার দন্তকপাটি
হাঁ করে নাড়িস তুণ্ড খা পেঁচির মুণ্ড ।'

— এই মন্ত্র বলেই ধুলোপড়া দিলে শত্রুর মুখ বন্ধ বা বাক্‌রোধ হয়। এই রকম তুকতাকের কথা নিরক্ষর দরিদ্রমহলে এখনও কিন্তু খানিক খানিক চালু আছে। প্যাঁচা প্যাঁচানির খাসা চ্যাঁচানি আমাদের সাহিত্যে তেমন কদর সত্যিই পায়নি। কবি জীবনানন্দের অবিশ্যি একটা গোটা কবিতাই আছে প্যাঁচার ওপর । কিন্তু জীবনানন্দের কাব্যে প্যাঁচার বিশিষ্ট ব্যবহার নিয়ে কোনো কথা আমরা এখানে বলতে চাই না। তবু কবি যখন বলেছেন মৃত্যুর পর হয়তো তিনি আবার পৃথিবীতে প্যাঁচা হয়ে এসে গাছের ডালে বসে থাকবেন, তখন সেই নির্জন বিলাসীর অলৌকিক কল্পনায়, আমরা যেন আবিষ্ট হয়ে পড়ি। কবির পুনর্জন্মের এমন কামনার কথা জানতে পারলে পাখি কী বলত কি জানি !

আমাদের সম্রাট জাহাঙ্গীর একটিও প্যাঁচার ছবি আঁকাননি । অথচ লক্ষ করেছিলেন যে তার গড়নটা অদ্ভুত । তুজুকে এক জায়গায় পাই নানারকম ফল খাচ্ছেন আর তাদের ওজন করাচ্ছেন— একবার বললেন 'খুব বড়ো ছিল পিচগুলো, এক একটা প্যাঁচার মুণ্ডুর মতো বড়ো ।' 'উপমা জাঁহাগীরস্য' — বলবার তো কিছু নেই।

পক্ষিপ্রবরের নামটি ব্যবহার করে কালীপ্রসন্ন সিংহমশাই হুতোম প্যাঁচা সেজে নকশা উড়িয়ে অমর হয়ে আছেন। ইদানীং কালে যুগান্তরের পাতায় বিনয় ঘোষ 'কালপ্যাঁচার বঙ্গদর্শন' বলে একটা সিরিজ করেছিলেন। কলকাতা হাইকোর্টের বার লাইব্রেরি ক্লাব ১৯২৫ সালে একটি সচিত্র শতবার্ষিকী স্মারক পত্রিকা বের করেছিল — তাতে আটজন জজকে প্যাঁচা সাজিয়ে 'ফুল বেঞ্চ' নামে একটি অসামান্য ছবি ছিল। প্রত্যেক প্যাঁচার মাথায় জজেদের পরিচয়সূচক যে আদ্যক্ষর দেওয়া ছিল ১৮৯৬ সালের সেই রহস্যভেদের আজ আর কোনো উপায় নেই। পরিচিত এক রসিক ব্যক্তি বলতেন প্যাঁচার গায়ে চাপকান, মাথায় টুপি দিলে সে হয় জজ। মুখে পাইপ আর হাতে ছড়ি দিলে হয় অ্যাটর্নি, আর পায়ে কলম ধরিয়ে দিলে হয় অ্যাডভোকেট । মেদিনীপুরের পোটোরা ছাড়া আমাদের শিল্পীরা প্যাঁচার ভালো ছবি এঁকেছেন বলে জানা নেই। তবে গড়নের গুণে

খেলনায় তার খুব কদর। মাটি, পেতল ও ডোকরার কাজে খুবই ভালো প্যাঁচা দেখা যায়। কাটোয়া, কাশী আর কালীঘাটে কাঠের প্যাঁচা বিখ্যাত ছিল। ইদানীং দেখছি প্যাঁচা আবার বসার ঘরেও খুব সমাদর পাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত তাকে খাতির করে একরকম চুরি করেই একটা চৌপাই লেখার চেষ্টা করে প্রসঙ্গ শেষ করি —

সবাই দেখে বৃদ্ধ প্যাঁচা মোটা ওকের ডালে
জ্ঞানী বলেই জড়ায় না সে কথা বলার জালে।
যতই কম দেখে সে চোখে ততই বেশি শোনে
তাহার ঢঙ্ নকল করি চলুক পঞ্চজনে।

'উন্দুর'-চরিত

উই আর ইঁদুরের দেখ ব্যবহার
যাহা পায় তাহা কেটে করে ছারখার
কাঠ কাটে বস্ত্র কাটে কাটে সমুদয়
সুন্দর সুন্দর দ্রব্য কেটে করে ক্ষয়।

সেকালের কলকাতা শহরে বেশির ভাগ মধ্যবিত্ত বাড়ির একতলা ছিল অন্ধকার। রান্নাঘর বোঝাই হাঁড়ি কড়া নিত্যিকার বাসনকোশন সব ছিল ওড়িয়া বামুন ঠাকুরের খাস দখলে। কোনো পাত্তরে সে ঢাকা দিত না, মধ্যে মধ্যে ইঁদুর আরশোলা পড়লেও কেউ মাথা ঘামাত না, অগোছালোভাবেই ছেলেপিলেরা মানুষ হত। সর্বদা পায়ে পায়ে নেংটি ইঁদুর ঘুরঘুর করত, জলের জালা, ঘুঁটে কয়লার বাক্‌স, বালতির পাশে ধাড়ি ইঁদুরও থাকত। একবার আমার এক মামাতো ভাই গুনগুন করে বকুলের তলায় দোদুল গাইতে গাইতে সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন আর কাজলা মেয়ে বলেই বিকট চেঁচিয়ে উঠলেন— ওরে ব্বাস নেংটি ইঁদুর মাড়িয়ে ফেলেচি রে ! সে ইঁদুর ধরবার জন্যে কাঠের কল পাতা হত, তার ভেতর ভালো ঘি মাখানো পাঁউরুটির টুকরো গাঁথা। প্রায়ই ইঁদুর ধরা পড়ত, রাস্তায় ছেড়ে দিলে কাগেরা নিয়ে যেত। ধাড়ি ইঁদুর ধরার একমাত্র যন্ত্র ছিল জাঁতাকল । অনেক দিন পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল যে ইঁদুর বুঝি ডিম ফুটে বেরোয়, সাধে কি সঙ্গীরা সবাই আমাকে হাবা বলত ! ইঁদুরছানার যে জন্মের সময় চোখ ফোটে না,,তাও জানতুম না। চোখ ঢাকা ইঁদুর দেখে তখন খুব মায়া হত !

নেংটি ইঁদুর ভারি আমুদে আর নাচুনে হয়। তারাশঙ্করবাবুর মা ভাঁড়ার-ঘরে ঢুকে

যেদিন দেখতেন ইঁদুর নাচছে না, বুঝতেন — ঘরে সাপ ঢুকেছে। আমার বন্ধুর দেশের বাড়িতে ছাতের ঘরে রঙিন সিমেন্টের নকশার ওপর রোজ মাঝরাতে জোড়া ইঁদুর এসে নাচের আসর বসাত।

একটু সাবালক হলেই ইঁদুর সর্বত্র তার দাঁতের জোর ফলায়। ছেলেদের জুতো জামা বইখাতা তো সামান্য কথা, ভারী ভারী শালকাঠের কপাট কেটে তার যাতায়াতের পথ তৈরি করত। মোট কথা তার উৎপাতে সব মানুষ আর সব দেশই অস্থির । একমাত্র রানী চন্দের লেখায় পড়েছিলুম রাজস্থানে বিকানীর রাজ্যে কারণি দেবীর মন্দিরে ইঁদুর পুজো হয়। ওই মন্দিরের চত্বরে পনেরো বিশটা করে ধাড়ি ধাড়ি ইঁদুরকে গায়ে গায়ে ঠেস দিয়ে ঘুমোতে দেখে, তিনি একরকম ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। ওদেশে নাকি কেউ ইঁদুর মারে না, তাজ্জব ব্যাপার। যেসব বাড়িতে বইয়ের বোঝা থাকে, তারা অবিশ্যি করে গণেশ ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে — ঠাকুর, তোমার বাহনটিকে সামলে রেখ। ইঁদুরের বই কুচোনো নিয়ে সেকালে অধ্যাপক ললিত বাঁড়ুজ্যে এক দার্শনিক জাল বিস্তার করেছিলেন। সেটি এরকম : ধোপার গাধা কাশ্মীরি শাল আর রেলির থান শুধু বয়েই বেড়ায়, সেগুলো কখনও তার নিজস্ব হয় না, ঠিক যেমন আমাদের গ্র্যাজুয়েটরা শেক্‌স্‌পিয়র আর বেকন পড়ে, কিন্তু কিছুতেই নিজস্ব করতে পারে না। এক বস্তা কাপড় গাধার পিঠে না চড়িয়ে যদি ইঁদুরের পেটে যায় তবে দেখা যাবে বস্তা সুদ্ধু উবে গেছে, পেট চিরেও কাপড়ের টুকরো পাবে না। দাঁতের প্রসাদে হয়তো অস্থিমজ্জায় চলে গেছে। এর নাম অ্যাসিমিলেশন। যদিচ দাঁত মাজে না তবু তার দাঁত সর্বদা ঝকঝকে আর ধারালো। পুরোনো আমলে দুধে দাঁত পড়ে গেলে সেটি হাতে করে ছেলেরা ইঁদুরের গর্তে দিয়ে বলত — ইঁদুর ভাই আমার দাঁত তুমি নাও, তোমার দাঁত আমায় দাও । মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কালিদাসের উত্তরমেঘ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যক্ষপত্নীকে বলেছেন ইঁদুরদাঁতি, মানে শিখরিদশনা। বেচারা ইঁদুর জানতে পারেনি— কী গৌরব তাকে দেওয়া হয়েছিল।

আমার এক দিদি ছিলেন খুব রোগা পাতলা মানুষ কিন্তু তর্ক করতে ওস্তাদ। শিলিগুড়ির মস্ত এক জমিদার গিন্নি একবার তাঁর সঙ্গে তর্কে হেরে গিয়ে বলেন, 'তুই দেখি বড়োদের কথায় ইঁদুরের মতো কুটুস করে দাঁত বসাস, বাহাদুরি খুব, ভাগ্যে মুখখানা ছিল, নইলে কবে শেয়ালে টেনে নিয়ে যেত ।'

যে কোনো গ্রন্থসংগ্রহের দেওয়ালে গেঁথে রাখার মতো একটি উদ্ভট শ্লোক আছে, সেটি এই— চৌরাৎ রক্ষ, জলাৎ রক্ষ, রক্ষমাং শ্লথ বন্ধনাৎ।/আখুভ্যো মিত্রহস্তেভ্য এবং বদতি পুস্তিকা ।।

অর্থাৎ বই বলছে — চোরের হাত থেকে, জলের হাত থেকে, আলগা বাঁধাই থেকে, ইঁদুরের হাত থেকে, বন্ধুর হাত থেকে আমাকে বাঁচাও। অকালে নিহত প্রতিভা সোমেন চন্দের ইঁদুর নিয়ে একটি অসাধারণ গল্প আছে — যেখানে ইঁদুর গরিবের সংসারে এক ভাঁড় দুধ উলটে অশান্তি ডেকে এনেছিল । অধ্যাপক অশোক মিত্র এ গল্পের তর্জমা করার ফলে বহু ভাষায় 'ইঁদুর'-এর অনুবাদ হয় এবং গল্পটি বিপুল খ্যাতিলাভ করে। ধাড়ি ইঁদুরেরা মাঠে ধানখেতে নানা ধরনের গর্ত খুঁড়ে ধান ভরে ভরে লক্ষ্মীর ঘর গড়ে তোলে। চাষিরা চাষ করতে গিয়ে তাদের ঘর ভাঙে।

ব্লেকের কবিতার 'বেস্ট লেড প্ল্যানস অফ মাইস অ্যান্ড মেন' প্রবাদ হয়ে গেছে বহুদিন। অ্যালেকজান্ডার পোপের 'টাউন মাউস অ্যান্ড কান্ট্রি মাউস', তা ছাড়া 'ডর-মাউস অ্যান্ড ফিল্ডমাউস', মেরি হোউইটের লেখা, সবই সরল কবিতা। ব্রাউনিং-এর 'পাইড পাইপার অফ হ্যামলিন' ছাত্রজীবনে সবাই পড়েছেন। শেক্‌স্‌পিয়রের 'মাউস' ক্রিয়ার অর্থ ছিল কামড়ানো। 'কিং জন' দ্বিতীয় অঙ্কে দেখি — 'নাউ ডেথ ফীস্‌ট্‌স্‌ মাউসিং দ্য ফ্লেশ অফ মেন'।

আফ্রিকার জঙ্গলে বাঙালির বসবাস আর তাদের জীবিকা নিয়ে বার্ড কোম্পানির জিওলজিস্ট শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ 'জঙ্গলে জঙ্গলে' নাম দিয়ে যে অসামান্য বইখানি লিখেছিলেন সেখানে পাই তিনি স্বপ্নেও ইঁদুর দেখছেন। তখন তাঁর প্রচণ্ড ম্যালেরিয়া, কোনো ওষুধবিষুধ নেই — কাঠের মাচায় শুয়ে দেখছেন, শাল গাছের ডালে ডালে সারি সারি টপ হ্যাট পরা ইঁদুর তাঁকে দেখে গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়ছে আর বিড়বিড় করছে, অর্থাৎ ইঁদুরেরাও যেন হতাশ হয়ে পড়েছে। বিভূতিভূষণের একাধিক গল্পে আছে বাঙালির ছেলেরা চীনে গেছে, দোকানে ঝুলছে সারি সারি ইঁদুর ভাজা। সিটি কলেজের অধ্যাপক বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়েরও এমনি অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁর সাঁওতাল বন্ধু তাঁকে নেমন্তন্ন করে মহুয়ার পাতার থালা জুড়ে প্রকাণ্ড এক মেঠো ইঁদুর সম্পূর্ণ আস্ত সেদ্ধ করে খেতে দেয়। বিনোদ ভয়ে চিৎকার করে ছুটে পালিয়ে যান ('স্মৃতিকথা', প্রথম ভাগ) । ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে যে ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট বা ফেবল সংগ্রহ বেরোয় তার অনুবাদ করেছিলেন তারিণীচরণ মিত্র। তারিণীচরণের বইতে ইঁদুরের নিজের খাওয়ার ফর্দটি অতি লোভনীয়। ইঁদুর তার বান্ধবীকে নেমন্তন্ন করেছে— সকালবেলায় দেবে ঢাকাই পনির ও বরাহ মাংস, সন্ধ্যায় দেবে দুধের সর, মোরব্বা আর পাত্র ভরে অতি উত্তম মদিরা— ততটা মদ দেবে যাতে গোঁফ ডুবিয়ে খাওয়া যায়। আহা এমন খাওয়া যে মানুষেরই জোটে না। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল-এ ইঁদুরের কারণে হর-

পার্বতীর কলহ এর পাশে নেহাতই পানসে ঠেকে। শিব বলছেন —

কত ঘরে আনি
লেখা নাহি জানি
দেখি অন্ন নাহি থাকে
কতেক ইন্দুর খায় ঘুর ঘুর
গণার মুষার পাতে।

গৌরী বলছেন — বাপের সাপে পোয়ের ময়ূর সদাই করে কেলি।
গণার মুষায় থলি কাটে আমি খাই গালি।

ইঁদুরের নামে কিছু ছড়া প্রবাদও পাওয়া যায় । প্রথমটি একশো বছরেরও আগে। 'এক যে ছিল ইঁদুর তার কপাল ভরা সিঁদুর । সে হদে (গর্তে) দিল মাথা ফুরোল আমার কথা।' প্রবাদ বলতে — ইঁদুর মরে গর্ত খুঁড়ে। সাপ এসে দখল করে। 'ইঁদুরের গোলাম চামচিকে তার মাইনে নয় সিকে ।' এইসব আর কি! বড়ো ছড়াটি ব্যস্তসমস্ত ইঁদুরের ঘরকন্না নিয়ে। কাজের ফাঁকে একজন তাকে খবর দিলে, 'ইঁদুর ভাই, ইঁদুর ভাই, তোমার বাপ এয়েচে ।' ইঁদুর তৎক্ষণাৎ বললে, 'গাল তুবড়ো ঢোকনা বুড়ো কেন এয়েচে ?' তারপর মায়ের আসার খবরে বিরক্ত হয়ে বললে — 'পরঘরুণি শাক বেচুনি কেন এয়েচে ?' সবশেষে এল বউ আসার খবর — ইঁদুর দু-পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে নেচে নেচে বললে, 'এস বউ বস খাটে ধান রেখেছি পাটে পাটে।'

'পাপুর বই' থেকে মনোজ বসুর একটা পদ্য এবার শোনাই :

'রাত দুপুরে হুলো বেড়াল ইঁদুর করে তাড়া।
ইঁদুর বলে বাঁচাও বাঁচাও প্রাণে গেলাম মারা,
ঘুমের ঘোরে হঠাৎ কিসের কান্না আসে কানে ?
লম্ফ দিয়ে ছোট্ট খোকন পড়ল মধ্যিখানে।
গর্জে ওঠে — মারবি ইঁদুর, ও হুলো নচ্ছার !
এগিয়েছিস কি ছুঁড়ে দেব হিমালয়ের পাড়
হুমকি শুনে হুলোর তখন হল বিষম ভয়
কান মুলছি নাক মলছি খোকন মহাশয়।
ইঁদুর ধরে মারব কেন ? সেকি সর্বনাশ
জোড়া ইঁদুর হালে জুড়ে করব ধানের চাষ ।।

শিবা-চরিত

এক যে ছিল শেয়াল, তার বাপ দিচ্ছিল দেয়াল।
তার বাপের নাম রতা, ফুরুল আমার কতা।।

আদ্যিকালের এই ছড়া সব বুড়োরাই জানেন। দেয়াল দিচ্ছিল মানে — গাঁথছিল। দেয়াল দেওয়া, কুয়ো দেওয়া, পাশ দেওয়া, এসব পুরোনো কলকাতার কথা। একবার রবীন্দ্রনাথও লিখেছিলেন। ঝোপে জঙ্গলে, পুকুর পাড়ে, ভাঙা দালান কোঠার আশপাশেই শেয়ালের রাজত্ব। সেখানে শেয়াল কী করে তা অবন ঠাকুরের 'একে তিন তিনে এক' বইটাতে সব লেখা আছে। রবীন্দ্রনাথের 'সে' গ্রন্থে সান্ধ্য আসরে নাতনিকে সুকোমল-লাঙ্গুলী শেয়ালের গল্প বলে 'শিবাশোধন কমিটির' রিপোর্টের কথা বলা আছে। রোজ রাত্তিরে ন-টার পর সেই শিবাশোধন মণ্ডলীর সভায় শেয়াল শোধন রূপ পুণ্য কর্ম সাধিত হয়। শোধনের পর শেয়ালের নাম হয় খাসালেজুড়ি আর সুকোমললাঙ্গুলী ।

পঞ্চতন্ত্র, জাতক, তা ছাড়া সংস্কৃত পালি অভিধান মিলিয়ে তার কত যে নাম ! শিবা, গোমায়ু, মৃগধূর্তক, বঞ্চক, ক্রোষ্টুক, ফেরুক, জম্বুক । আরো না হয় থাক। সে কি আজকের মানুষ না হালের জানোয়ার ? মিশরে পিরামিডের দেয়ালে শেয়ালের ছবি অনেক দেখা যায়। ওদেশের মানুষ সূর্যদেবতার আগে বেড়াল শেয়াল নেকড়ে বাজপাখি এসবের পুজো করত । খাঁটি ভারতীয় প্রাচীন ছবিতে শেয়ালের ভালো ছবি দেখিনি বলেই মনে হচ্ছে । শিল্পী ড্যুয়েরার যেমন ছোটো কাঠবেড়ালি এঁকেছিলেন, সেরকম কোনো ছবি কেনেথ ক্লার্কে আছে কি না এখন মনে পড়ছে না। হিন্দু-বৌদ্ধ মিশ্র যুগে ভয়ংকরী চামুণ্ডা মূর্তিতে রক্তপানরত শেয়ালকে দেখেছি । ওই মূর্তিটি কালীঘাটের কাছে

গঙ্গার ধারে কুড়িয়ে পাই ; বহু বৎসর আমার কাছে তিনি ছিলেন । তারপর বিজ্ঞজনের পরামর্শে রামকৃষ্ণ মিশন কালচার ইন্সটিটিউটের মিউজিয়মে সেটি দান করা হয়েছে। বৌদ্ধতন্ত্রে শিবামূর্তির রূপবর্ণনা এবং উপাসনার কথা আছে। জাপানে কোনো কোনো মন্দিরে শিবাকে ডাকিনী এবং জাদুবিদ্যার ঈশ্বরী রূপে পুজো করা হত বলে জানি। শেয়াল প্যাঁচা সাপ এরা সবাই অন্ধকারের জীব, তাই তন্ত্র এদের নিয়েই ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড চালায়। প্রভু যীশু বলেছিলেন একটা শেয়ালেরও গর্ত থাকে কিন্তু ঈশ্বরপুত্রের মাথা গোঁজবার ঠাঁই নেই।

প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজির অসাধারণ অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্রের পিতা সমস্ত বৌদ্ধ জাতকের ছ'খণ্ডে বাঙলায় অনুবাদ করেন। সেখানে বিস্তর শেয়াল কিন্তু তারা চতুর হলেও ঠিক ভয়ংকর নয়। বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্রে শেয়ালের অনেক ছবি। সব থেকে মনোহর ছবি হল — 'নীলবর্ণ শৃগাল কথা'। সেই যে লাফাতে লাফাতে শেয়াল অন্ধকারে পড়ে গেল ধোবার নীলগোলা প্রকাণ্ড গামলায়, তারপর তাকে আজব জানোয়ার ভেবে রাজা করা হল। বেশ চলছিল, হঠাৎ একদিন মানে এক রাতে জাতভাইয়ের গলা শুনে বেচারা মাতৃভাষায় হুক্কাহুয়া ডেকে উঠেই ধরা পড়ে গেল।

শেয়াল খুব কাঁকড়া ভালোবাসে, পঞ্চতন্ত্রে শেয়ালও আছে, কাঁকড়াও আছে, কিন্তু শুধু কাঁকড়া আর শেয়াল নিয়ে একটা আলাদা গল্প থাকা উচিত ছিল। শেয়ালের কান দুটো শিঙের মতো তাই তার নাম শঙ্কুকর্ণ, সর্বদা হাড়মাংস মুখে নিয়ে ঘোরে তাই সে ক্রব্যমুখ। শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী মড়ার খুলি মুখে শেয়ালের একটা ছবি এঁকেছেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত তারিণীচরণ মিত্রের 'ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট' বইখানায় বিস্তর শেয়ালের গল্প। ঘুরে ফিরে এরাই ঈশপের নীতিমালায় আসে, তাই বিদ্যাসাগরের কথামালাতেও এদের দেখি। কথামালার প্রথমে ফলন্ত আঙুরতলার নিচে ঊর্ধ্বমুখ শেয়ালের ছবি সর্বত্র পরিচিত । আমাদের এক মাসি কালো রেশমি কাপড়ে সাদা ডি এম সি সুতো দিয়ে ছোটো ছোটো ফোঁড় তুলে সেই সঙ্গে মাছের আঁশ সরু করে কেটে আঠা দিয়ে জুড়ে 'শৃগাল ও দ্রাক্ষাফল' তৈরি করেন। মেয়ে দেখতে এলে পাশের বাড়ির থেকে সেই আহামরি ছবি চেয়ে নিয়ে গিয়ে পাত্রীর হাতের কাজ বলে তখন দেখানো হত । মহিলা সমিতিতে বহু প্রাইজ পাওয়া সেই ছবিখানা কবে কোথায় হারিয়ে গেল।

শেয়াল শুধু হিংস্র নয় ঘরভাঙানিও বটে — পঞ্চতন্ত্রের প্রথমে দেখি, করটক আর দমনক, সিংহ আর ষাঁড়ের বেজায় ভাব। লোভী শেয়াল মাঝে এসে তাদের সেই 'মহান স্নেহ' নষ্ট করে দিল। দিশি উপকথার সংগ্রহ প্রথম করেন রেভারেন্ড লালবিহারী দে সেই ১৮৮২ সালে। তাঁর বাড়ির দাসী শম্ভুর মা এই গল্পগুলো তাঁকে শুনিয়েছিল। সেখানে

এক চূড়ামণি শেয়াল ঘটক সেজে রাজকুমারীর সঙ্গে এক বোকা জোলার বিয়ে দিয়েছিল। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'টুনটুনির বই' প্রথম বেরুল ১৯১০ সালে, তাতেও ওই একই গল্প। শেয়ালের গল্প সব দেশেই আছে, জাপানের গল্প আবার খুব সরল নয়, হান্স আন্ডারসেন, রেনার্ড দ্য ফক্স শিশুপাঠ্য । 'ভারমিলিয়ান বোট'-এর লেখক বহুভাষাবিদ সুপণ্ডিত সুধীন্দ্রনাথ ঘোষের ঝোঁক ছিল শেয়ালের গল্প জড়ো করার — তাঁর সেই সংগ্রহ বোধহয় ছাপা হয়নি । 'হাসিখুশি' 'রাঙাছবি'র লেখক যোগীন্দ্রনাথ সরকারের বইয়ে শিবু শেয়াল ঘরে ঢুকে ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় মুখ দেখে আর মিট মিট করে হাসে । জ্ঞানেন্দ্রনাথ হালদারের ঝিকমিকে বইয়ে সে ব্যাট হাতে ক্রিকেট খেলতে যায়। কুচবিহার রাজ্যের দেওয়ানপুত্র চারুচন্দ্র দত্ত বন্দুক ছুড়তে শিখেই মাতৃআজ্ঞায় শিকার করলেন এক কেঁদো শেয়াল। শেয়ালেরা ছোটো ছোটো ছেলেদের দালান বা উঠোন থেকে টেনে নিয়ে যেত। 'পথের পাঁচালি'তে দেখি সর্বজয়া পুকুর থেকে কাপড় কেচে ঘরে ঢোকার সময় ছেলের গলা না পেলে ভাবত — খোকাকে শেয়ালে টেনে নিয়ে যায়নি তো ? আমাদের পুরোনো দাসী কার্তিকের মায়ের তিন মাসের ফুটফুটে মেয়েকে মেটে দাওয়া থেকে শেয়াল টেনে নিয়ে যায়, বুড়ো বয়েসেও সেই গল্প করতে গেলে তার চোখে জল আসত।

যে-শেয়াল এমন হিংস্র নিষ্ঠুর তাকে আবার পুজো দেবার একটা ব্যাপার আছে। কালীপুজোর রাতে মাটির সরায় যে-শিবাভোগ থাকে সেটা শ্মশানে বিসর্জন দেবার নিয়ম। শ্মশান না থাকলে জলে অর্থাৎ নদী বা পুকুরে দেবার নিয়ম। শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত পূজারী আর যজমানেরও শেয়ালের ওপরে নির্ভরতা দেখা যায়। তাই ঘোর অন্ধকারে ফাঁকে ফাঁকে তাঁরা শেয়ালের ডাকের অপেক্ষা করেন, বিশেষ করে শেষ প্রহরে রাত তিনটের পর থেকে শেয়ালের ডাক শুনলে তাঁরা মনে করেন দেবীর পূজা সম্পন্ন হয়েছে। দক্ষিণাকালীর একটি নামও ক্রোষ্টুমুখী । গৃহস্থের নিজস্ব উৎসব, যেমন নবান্ন আর পৌষপার্বণেও শেয়ালকে ভাগ দিতে হয়। কলকাতার রাস্তার ওপর সব বাড়িঘর, সেখানে পাঁদাড়ই বা কোথায় ? আমরা একটুখানি নবান্নের ভাগ বাড়ির ছাদের দেয়ালে দিয়ে বলতুম, 'কাগারে বগারে নবান্ন খা রে'। শেয়াল আর কাক এই দুটি নিকৃষ্ট জীবকে খাইয়ে তবে গৃহিণীর পার্বণ শেষ হত । সে আমলে মহাগুরু নিপাত অর্থাৎ বাবা কিংবা মায়ের মৃত্যুর পর একোদ্দিষ্ট আদ্যশ্রাদ্ধ শেষ হতে চারটে বেজে যেত। তারপর সমস্ত খাদ্যবস্তু মাটির দেওয়া থালা ও খুরিতে সাজিয়ে জলের ভাঁড়সুদ্ধু শ্মশানে পাঠিয়ে দেওয়া কিংবা গঙ্গাতীরে রেখে আসার ব্যাপার ছিল কোনো কোনো বাড়িতে ।

আলিপুরের চিড়িয়াখানায় আগে শেয়াল ছিল না মনে হয়, তবে ভাওয়ালের মেজকুমারের পশুশালায় ধূসর লালচে আর সম্পূর্ণ সাদা এই তিন রকম শেয়ালই ছিল

বলে জানা যায়। পূর্ণিয়াবাসী লেখক সতীনাথ ভাদুড়ীর কাছে কোনো পাগল (?) এসে সদ্যোমৃত শেয়ালের খোঁজ করে। তার পেট চিরে তার মধ্যে পা ঢুকিয়ে বসে থাকলে নাকি রোগীর গোদ সেরে যাবে। সতীনাথ এমন অশ্রুতপূর্ব টোটকার ব্যবস্থা করে উঠতে পারেননি। শেয়ালের যুক্তি মানে বৃথা যুক্তি। পাড়াগাঁয় পথে যেতে সন্ধ্যার পর অনেকে দেখেছেন ঘোড়ার ক্ষুরের মতো বেড় দিয়ে সারি সারি একদল শেয়াল চুপ করে বসে থাকে, তাদের চেয়ারম্যান হয় এক কেঁদো শেয়াল।

এবার আসি তার নাসিকা প্রবেশে — তারকনাথ গাঙ্গুলির 'স্বর্ণলতায়' পাই — 'একটা শৃগাল ডাকিয়া উঠিলে যেমন যত শৃগাল আছে সকলে ডাকিয়া উঠে, তথায় তেমনি যত বিধবা ছিলেন সকলে দিগম্বরীর মতে মত দিয়া সরলার নিন্দা করিতে লাগিলেন, কেন সে গোপালকে বাঁশি কিনিয়া দিবে বলিয়া প্রমদার কাছে এক পয়সা ধার চাহিয়াছিল ।' বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত মনুষ্য ফলের কথা বলতে গিয়ে কাঁঠালের কথা বলেছেন, কাঁঠাল থেকে এল কাঁঠালখেগো শেয়ালের কুলুজি, যা এইরকম — মনুষ্য শৃগালেরা কেহ দেওয়ান, কেহ নায়েব, কেহ গোমস্তা, কেহ কারকুন। মাইকেল মনে ভেবেছিলেন কাক ও শৃগালী নামে কবিতা লিখবেন, আরম্ভ করেও শেষ করা হয়ে ওঠেনি, সেটা এইরকম —

একটি সন্দেশ চুরি করি
উড়িয়া বসিলা বৃক্ষোপরি—
কাক হৃষ্টমনে; সুখাদ্যের বাস পেয়ে
আইল শৃগালী ধেয়ে
দেখি কাকে বলে দুষ্টা মধুর বচনে — হে নবনীরদকান্তি
ঘুচাও দাসীর ভ্রান্তি
জুড়াও এ কান দুটি করি বেণু ধ্বনি ।

একশো বছর আগে হুগলি জেলার সুকিন্দে (সুগন্ধা) গ্রামে এক মাস্টারমশাই রায়বাড়িতে পড়াতে আসতেন। মাঠের আল ভেঙে শুঁড়িপথ দিয়ে আসতে আসতে তিনি দেখলেন — দুটো ধাড়ি শেয়াল মস্ত দুধের কড়ার আঙ্টা ধরে জ্বাল দেওয়া ঘন দুধ নিয়ে পালাচ্ছে । ভদ্দরলোককে দেখেই ক্ষীরের কড়া ফেলে শেয়ালেরা পালাল। দিদিমা ওই ক্ষীর ঘরে তুলতে দিলেন না। শেয়ালের দৌলতে বিন্দু কাদী আর হারানী প্রাণভরে ক্ষীর খেলে। কাদীর যখন বিরানব্বই বছর বয়েস তখন তাকে যেন দেখেছি বলে মনে হয়।

ভারতের বৃহত্তম ফল কাঁঠাল। কোনো কোনো গাছে গোড়া থেকে শুরু করে গোটা গুঁড়ি জুড়েই ফল ধরে, শেষের ফলগুলো মাটিতে গেঁথে যায়। এমন গাছকে বলা হয়

শেয়ালখাগী। দুটো কদাচিৎ তিনটে শেয়াল মিলে কত কৌশলে যে একমন দেড়মন ফলগুলো পাড়ে তার উত্তম বর্ণনা দিয়েছেন রাজশেখরের দাদা শশিশেখর বসু। বিভূতিভূষণের 'ইছামতী'তে জামাই ভবানী বাঁড়ুজ্যে বলে যাচ্ছেন — মির্জাপুরে জঙ্গলে খুব আমলকি বেল আর বুনো আমের গাছ, তা ছাড়া আতার জঙ্গলও খুব। দুদশ ঝুড়ি পাকা আতা নাকি সেখানে শেয়ালেই রোজ খায়। আমরা বার দুই তিন মির্জাপুরে গেছি, জঙ্গলেও ঘুরেছি, কিন্তু গাছের পচা পাতা আর ডোবার জল ছাড়া আর কিছু জোটেনি — যার যেমন ভাগ্যি।

চোর, খুনি, ফন্দিবাজ জাতের অনেক মন্দ কথা বলে এবার তার মহিমার কথা একটু বলি — প্রহরে প্রহরে নিয়মিত ডাকের গুণে শেয়াল চিরদিন নিদ্রাহীন মানুষের বন্ধু। ভাদ্র মাসে কৃষ্ণপক্ষের গভীর রাতে অষ্টমী তিথিতে কংসকারাগারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম। দৈবী মায়ায় সব শৃঙ্খল খুলে গেল, প্রহরীরা ঘুমিয়ে পড়ল। পিতা বসুদেব সদ্যোজাত শিশুকে মাথায় নিয়ে যমুনা পার হয়ে গোকুলে গেলেন বন্ধু নন্দগোপের বাড়ি। যমুনার মধ্যে আগে আগে হেঁটে পথ দেখিয়ে যে নিয়ে গেল সে এক শৃগাল। কবি সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন — সমীরণ সম সমীরিয়া যাও শিবা/প্রকাশিত হোক পরম আবির্ভাব।

খাস বিলেতে জঙ্গল তেমন নেই বাঘসিংগি দুরের কথা। তাই শুধু ফক্স হান্টিং। শেয়াল মারার জন্য শিখিয়ে পড়িয়ে বাঘা কুকুরকে ফক্স হাউন্ড করা হত । রানী এলিজাবেথের যুগে ধারালো তলোয়ারকে 'ফক্স' বলা হয়েছে, শেক্স্পিয়রের 'কিং হেনরি দ্য ফিফ্থ্'-এ পাই — 'ও সেনর ডিউ, দাউ ডাইয়েস্ট অন্ দ্য পয়েন্ট অফ এ ফক্স'। শিকারের পর শেয়ালের চামড়ায় থলে হত বলে শুনেছি। শ্রী অশোক মিত্র বহরমপুর সার্কিট হাউসে ইন্ডিয়ান আর্মি সার্ভিসের অফিসার গাঙ্গুলির এক বিচিত্র কম্বল দেখেছিলেন যা চব্বিশটা শেয়ালের লোমেভরা চামড়া পর পর জুড়ে তৈরি ('তিন কুড়ি দশ') । শ্রীযুক্ত রাধাপ্রসাদ গুপ্তের 'পশ্বাবলীর' দুচার ছত্র এইরকম — দুষ্ট দুরাচার শৃগাল লুব্ধ অতিশয়/সর্বদা সে সর্ব লোকের অপকারী হয়।/পশুজাতি মধ্যে সেই অতি বিচক্ষণ/বিচিত্র তাহার দোষ কে করে বর্ণন।

ক্রমশ গাছপালা ডোবাপুকুর ঝোপজঙ্গল সব উধাও, পছন্দসই বাসা না থাকায় শেয়ালেরা লোপ পাবার মুখে — তাই প্রহরে প্রহরে ওদের ডাকে প্রভুরা বিরক্ত না হলেই ভালো। হাজার হাজার বছর পৃথিবীতে বাস করে প্রাণিজগৎ থেকে পশুটা লোপ পেলে, হয়তো একদিন আমাদের দুঃখে শেয়াল কুকুর কাঁদবে। বর্ষার মধ্যে হঠাৎ রোদ উঠলে — কারা বলবে 'জল পড়ছে রোদ উঠছে শেয়াল কুকুরের বিয়ে হচ্ছে' ! ছেলেরা

অষ্টরম্ভা

ছড়া ভুলে গেলে 'নাকুর বদলে নরুন পেলুম টাক ডুমা ডুম ডুম' কে গাইবে ! বাঁশবন মুড়িয়ে কেটে দিলে পাকা গোঁফ জোড়া নিয়ে ভুড়শেয়ালি নাচবে কোথায়? তার মাথার কনকচাঁপা যে ধুলোয় গড়াগড়ি যাবে। শেয়ালপণ্ডিত নামটি সেযুগে অনেকের পছন্দ ছিল। দৈনিক যুগান্তরে কাফী খাঁর নকশার সঙ্গে শেয়াল পণ্ডিত নাম নিয়ে পদ্য লিখতেন হরেন ঘটক । আরো কারা কারা যেন ওই নাম ব্যবহার করতেন এখুনি মনে আসছে না, যমদত্ত থাকলে তিনি বলতে পারতেন।

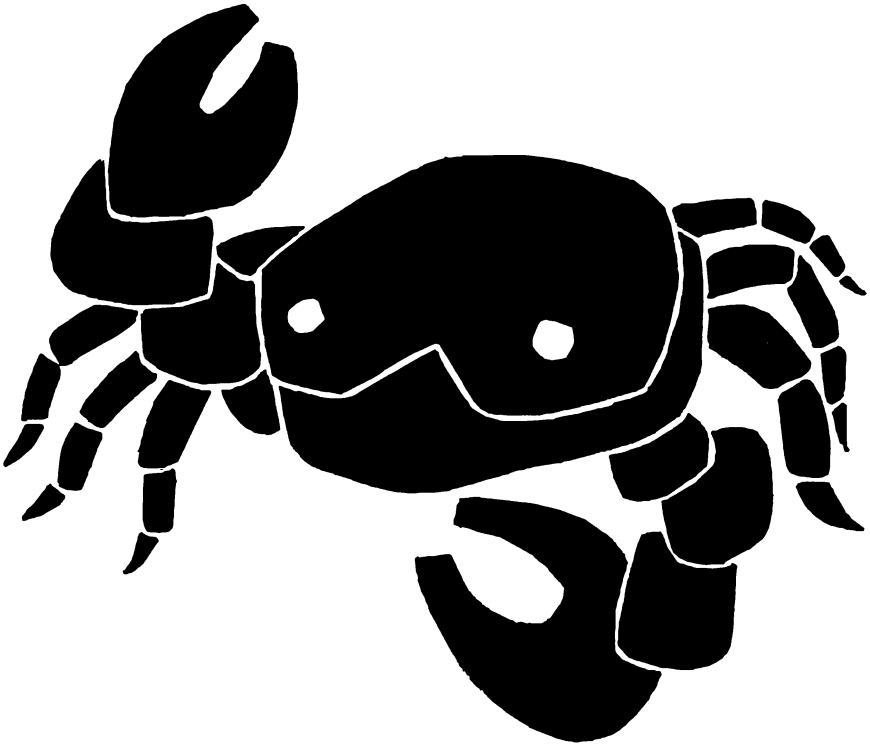

কাঙ্কুড়ি পালা

কাঁকড়ার অনেক নাম, অনেক জাত আর শাখা, কিন্তু সে সব কথা জীববিজ্ঞানী ও গবেষকদের, ষাট বছর আগে কলকাতার রান্নাঘরে যেটুকু দেখেছি শুনেছি শুধু তা বলাই আমাকে মানাবে। ব্রাহ্মণ বাড়িতে যাঁরা নিত্য তর্পণ সন্ধ্যা করতেন তাঁরা কাঁকড়া খেতেন না। এখনও কিছু কিছু মানুষ এমন আছেন। 'পথের পাঁচালি'তে পাই দুগ্‌গা গোকুলের বউকে জিজ্ঞেস করছে — 'কী রাঁধ্‌চ খুড়িমা ?' বউ বললে — 'ওরে মাছটা কুটে দিয়ে যা।' মাছ কুটতে কুটতে দুগ্‌গা বললে — 'হ্যাঁ খুড়িমা কোথায় কাঁকড়া পেলে, এ কি খায় ?'

'বিধু জেলেনি বলে গেল সবাই খায়, কিনলুম তাই। ওই অতগুলো পাঁচ পয়সায় দিয়েচে।' ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবেরা খেতেন না ঠিকই, গিরিবালা দেবীর 'রায়বাড়ি'তে কাঁকড়ার নাম-গন্ধ নেই।

কাঁকড়ার দেহখানি গোল আর চ্যাপ্টা। শক্ত একটা খোলা দিয়ে ঢাকা, তার নাম চাড়া। সামনের দুই পা খুব মোটা আর শক্ত, তাতে আবার কবজা আঁটা, এ দুটোকে ধরে পা মোট দশটা, তাই অন্য নাম দশরথ। সঙ্গে কাঁকড়া নিয়ে বেরুবার সময় নাম না নিয়ে বলতে হত — দশরথের ঝোড়াটা নিয়েচ ত ?

খেতে খুব সোয়াদি, তখন বাড়িতে জামাই কুটুম এলেই কাঁকড়া আসত আর গুষ্টিসুদ্ধ ছেলে দাঁড়া ভেঙে শাঁস চুষত আধ ঘন্টা ধরে। চিংড়ি আর কাঁকড়া অভিধানে বলে একই জাতের জীব, তবে কিনা চিংড়ি হল নৈকষ্য কুলীন আর কাঁকড়ার রূপ বা কুল-মর্যাদা না থাকলেও, শুধু সোয়াদের গুণে তার সর্বত্র আসা যাওয়া।

ভোজনরসিক রবীন্দ্রনাথ 'পাকড়াশীদের কাঁকড়া ডোবা' ছাড়া আর কিছু না লিখলেও জিনিসটা খেয়েছেন। বরানগরে রানী মহলানবিশের প্রতিবেশী পারুল ও দেববাণী ক্যারিয়ার আর গামলা ভরে নিরিমিষের সঙ্গে-প্রচুর মাছ, চিংড়ি আর কাঁকড়াও খাইয়েছিলেন। আনন্দবাজারের কোনো বিশেষ সংখ্যায় দেববাণী কিছু এসব লিখেছিলেন। এই ধাক্কায় কবির 'সে' বইখানা খুলতেই প্রথমে পেয়ে গেলুম পুপেদিদিকে, তার সঙ্গে লাউ-চিংড়ি। একদিন পুপেদিদির সেবক কানাই বাজারে গিয়ে দেখলে সেদিন জগদ্ধাত্রী পুজো, তাই চিংড়ির দাম আগুন, তাই সে বুদ্ধি করে ডিম ভরা কাঁকড়া এনে পুপেদিদিকে তো সন্তুষ্ট করলই, প্রচুর লাউডগা দিয়ে সেই দেবদুর্লভ রান্নার কথা পুপের দাদামশাই বেশ রসিয়ে লিখেছিলেন। শিল্পী নন্দলাল সিংহল ভ্রমণের সময় নজর করেছিলেন যে বড়ো বড়ো কাঁকড়া পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে দিব্যি আটকে আছে। অবন ঠাকুরের লেখায় শেয়ালের কথা বিস্তর, কিন্তু কাঁকড়া কেন যে নেই তা জানিনে। শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন'-এ পাই মেসের দাসী সাবিত্রী কালীঘাটে কালীদর্শন করে বাড়ি এসে দেখে তার ঘর বেদখল। মাসি মোক্ষদার দোরের সামনে কাঁকড়া চিংড়ি আর হাঁসের ডিমের খোলা পড়ে আছে। কাঁকড়া ছিল সব জাতের মানুষদের সস্তায় সেরা খাবার। কারণ তখন প্রায় হিন্দুবাড়িতে মুরগি খেত না। রান্নার বইতে রকমারি নাম দেখা গেলেও বাড়িতে মোটামুটি ঝোল আর ঝাল হত। ঘি গরমমশলা আর লঙ্কা দেওয়া লাল টুকটুকে ঝোলে ভরা বাটির কথা মনে পড়ে। মেয়েরা আবার শুকনো লাল লঙ্কা চিরে তার সব বিচি বের করে ফেলতেন। সেই অতিরিক্ত খোসা বাটা দিয়ে রংটার জেল্লা খুলত দারুণ।

রাধাপ্রসাদ গুপ্তর ভাষায় ওই টক্‌টকে লাল বাটি ভরা ঝোল দেখেই বাঙালির জিভ লকলক আর নোলা সক্‌সক্ করত। শেয়াল খুব কাঁকড়া ভালোবাসে। কাঁকড়ার গর্ত দেখলেই ন্যাজটা ঢুকিয়ে দেয়, বোকা কাঁকড়া কামড় দিলেই কাঁকড়াকে বের করে খেয়ে নেয়।

ছড়ায় পাই—

'কাঙ্কুড়ি বাঙ্কুড়ি পরমেশ্বরী
গর্তের বাইরে এসো নমস্কার করি।'

কাঁকড়া বলে — 'ওরে ওরে আমার গায়ে হোয়েচে জ্বর
গর্তের বাইরে থেকে নমস্কার কর।'

দেশ-বিদেশে কাঁকড়ার আদর; আমেরিকা, মালয়েশিয়া, জাপানে বহুদিন ধরেই নিছক জলে সেদ্ধ নুন মরিচ আর নানা রকম সস্ ঢালা যেমন-তেমন রান্না সবাই খুব খাচ্ছেন।

তাঁদের মুখে কাঁকড়ার আদরের কথা শোনা যায় । ছাত্রজীবনে ট্রেনে করে দক্ষিণ ভারত যাবার সময় ধনুষ্কোটির কাছ থেকেই দেখেছি বালির ওপর দিয়ে জবাফুলের মতো সার দিয়ে চলেছে। উজ্জ্বল বালির ওপরে কী যে বাহার! এর কোনো ছবি কিন্তু কখনও দেখিনি।

ক্লাসিকাল সংস্কৃতের প্রাচীনতম বই পঞ্চতন্ত্রে কাঁকড়াকে নিয়ে একটি সুন্দর গল্প আছে। এক বণিক বিদেশে যাচ্ছেন, তার মা বললেন সঙ্গে কিছু নাও, একলা যেও না — 'নৈকানি না গন্তব্যম্'। এই বলে একটা জ্যান্ত কাঁকড়া তুলে কৌটোয় পুরে ছেলের হাতে দিলেন। ছেলে দু-হাত বাড়িয়ে কৌটোটি ধরেন এবং সঙ্গে নিয়ে মায়ের ইচ্ছা পূরণ করলেন। সন্ধ্যার পর বণিক গাছতলায় শুলেন। কৌটো রইল মাথার কাছে। মাঝরাতে শব্দ শুনে উঠে দেখেন বিষাক্ত এক সাপ টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে। আলগা কৌটো খুলে কাঁকড়া বেরিয়ে এসে বণিকের প্রাণ বাঁচিয়েছে। বণিক ভাবলেন আমি যে দু-হাত বাড়িয়ে শ্রদ্ধা করে মায়ের হাত থেকে কৌটো নিয়েছি, সেই শ্রদ্ধাই আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে। মন্ত্রে আর গুরুর কথায় যার যেমন শ্রদ্ধা, যেমন বিশ্বাস থাকে, তার তেমনি ফল মেলে। এমন রক্ষাকারী প্রাণী কী করে এমন অশুভ জীব হয়ে গেল যে তার নাম পর্যন্ত নেওয়া চলে না, এর রহস্য জানা নেই।

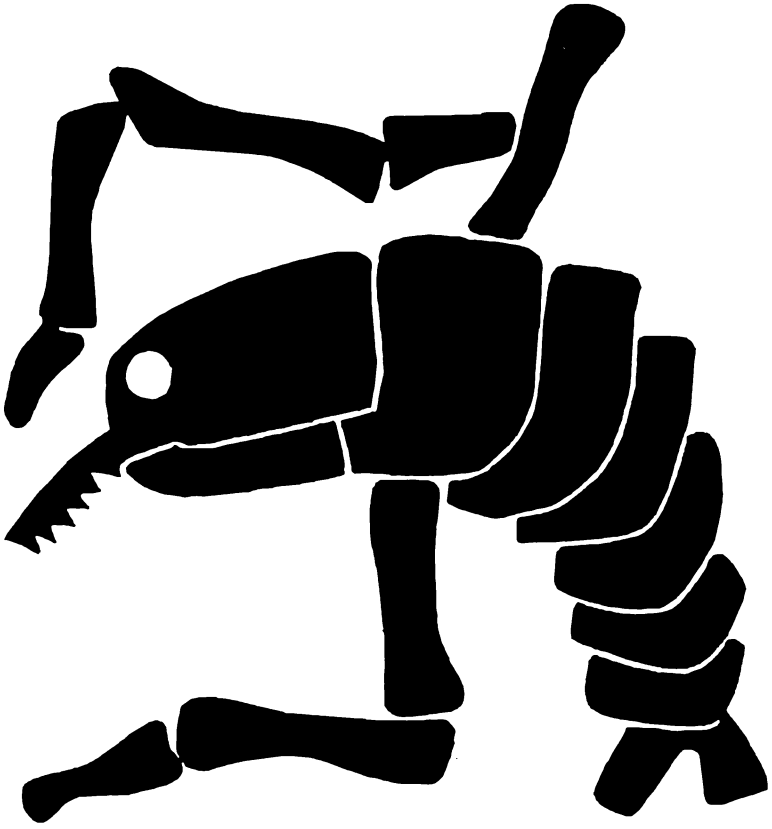

চিঙ্গুড়ি পালা

কাঙ্কুড়ির পালা শেষ হল। এবার সরাসরি চলে আসি চিঙ্গুড়িতে (শব্দটি ওড়িশায় চলে)। 'যদু আর বংশী ধর'-এর মতো এরাও যমজ ভাই। চিঙ্গুড়ি পালার মঙ্গলাচরণ গুপ্তকবিকে দিয়েই হোক — 'দীনের তারণকারী চিংড়ির ঘষো/সুমধুর বাতহর পয়সায় দুশো।' মুকুন্দরাম চণ্ডীমঙ্গলে তাঁর খুল্লনার জন্যে চিংড়ির বড়া ভাজিয়েছেন লহনাকে দিয়ে, কাঁঠাল বিচি দিয়েও সে ভাজে, তবে দুটোই ঘুষোর কারবার। শ্রীযুক্ত রাধাপ্রসাদ গুপ্ত আবার এক বিলিতি ফুল্লরার কথা বলেছিলেন। টমাস গেনসবরো বিখ্যাত ছবি 'শ্রিম্প গার্ল' (চিংড়ি বেচুনি) এঁকেছিলেন। মেয়েটা লন্ডনের পাড়ায় পাড়ায় কুচো চিংড়ি ফিরি করে বেড়াত।

ছবি আঁকবার মতো চেহারা বলেই না দিকপাল ভ্যান গগ তার ছবিটা আঁকেন। কালীঘাটের পোটোদের নাম-ধাম জানা নেই বলে তারাও কি কম যায় ? গুপ্তমশায়ের 'মাছ ও বাঙালি'র মলাটে তিনটে গলদা আর লাউ সুদ্ধু রুইমাছ ধরা এক তালেবরের ছবি। দাড়ি গোঁফ তরোয়ালধারী জামা জোড়া পরা চিংড়ি হল 'আমিষের সভাপতি'।

পঞ্চাশ বছর আগে আমি একবার দিন কয়েকের জন্যে কেষ্টনগর যাই। সেখানে খোড়ের ধারে (ভালো নাম জলঙ্গী) কুমোরপাড়া। খেলনা পুতুল, ফল-পাকুড়ের মধ্যে দেখি মস্ত গলদা চিংড়ি, নীল দাঁড়া কাঁটাওয়ালা। দাম চাইলে চার টাকা। তারপর বললে, ফোঁটা খানেক সরষের তেল জলে ফেটিয়ে দেখাবে কোনোটা মাটির বলে যদি ধরা যায় তবে আদ্ধেক দাম। অত পয়সা তখন কোথায়? তাই সেই নীলরক্ত সভাপতিকে ঘরে আনা যায়নি।

একবার কাঁকুলিয়া রোডে বিশ্বভারতী পত্রিকার সম্পাদক সুশীল রায়ের বাড়ি যেতে গিয়ে দেখি রাস্তার দু পাশে ফালি দিয়ে চিংড়ি আর ইলিশের ছবি আঁকা হচ্ছে। এক একটা ঘুড়ির সাইজ হবে পোস্টার করার মতো । সেদিন ছিল মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলা, পাড়ার ছেলেদের ফরমাশে আঁকা হচ্ছিল। ভাবলুম মোহনবাগান জিতলে একখানা ছবি নিয়ে বাড়ি যাব। ও হরি, মোহনবাগান যথারীতি হেরে গেল !

লোকে বলে চিংড়ি মাছ নয়। মাছ নয়, সে মাছের রাজা। রাজাদের অত জাত বিচার করতে নেই — মনু থেকে মহাভারত সকল শাস্ত্র বলে গেছে। যমদত্তের লেখায় চিংড়ি মাছ নিয়ে এমন কথা আছে, যা কানে শুনলেও প্রাণে আহ্লাদ হয়। যেমন খুলনা বাগেরহাটে গিয়ে তিনি দাঁড়া সুদ্ধু দু হাত ঘিয়ে ভরা চিংড়ি খেয়েছিলেন। বেলেঘাটায় কোলেদের তরফের বিয়েবাড়িতে কলাপাতা-জোড়া দেড়শো দুশোটি সুন্দরবনের চিংড়ি ছাতে খেতে বসে আমরা এক সঙ্গে দেখেছি। এখনকার বড়ো মানুষেরা বাপু বড়ো হিংসুটে, দুশো তিনশো টাকার এক একটা চিংড়ি শুধু নিজেরা খায়। মেয়েলি ছড়ায় আছে — 'রাজা ধন বিলোচ্ছেন কোথায় ? না অন্তঃপুরে, কুড়োচ্চেন কে, না পাটরানী।' তখন বড়ো মানুষেরা খাইয়ে ফতুর হতেও ভালোবাসতেন। গলদা চিংড়ি নিয়ে সংস্কৃত শ্লোক পেয়েছি একটি মাত্র।

'গলদাং বাগদাং রস্যাং নারিকেল সমন্বিতাম্।
অলাবু লোভনাং কৃত্বা তক্ষিতব্যং শুভে যোগে।'

দেবতার ভোগে আবার চিংড়ি অচল। শুধু ত্রিপুরার রিয়াং জাত চিংড়ির পুজো করে। শিশুর নামকরণের দিন পুরোহিতকে দক্ষিণা দেয় পাঁচটা চিংড়ি আর মোরগ। তাদের গানে প্রেমিকা নায়ককে বলে, যদি ভালোবাসবে তবে সামনে এসো। চিংড়ির মতো পাশ-সাঁতার কেটে হঠাৎ পালিয়ে যেও না। শ্রীঅরবিন্দভক্ত নলিনীকান্ত সরকারের আত্মজীবনীতে ('আসা যাওয়ার পথের ধারে') একটি নতুন নাম পাই চিংড়ির — 'জাল মাছ', মুরশিদাবাদের নিমতিতা জগতিতা অঞ্চলের চালু নাম।

ষাট সত্তর বছর আগে এ মাছটা সবাই খেতে পেত — ঘুষো থেকে গলদা। গরিব মানুষের খাওয়ার দুটো নমুনা দেখাই — নীরেন মাস্টারমশাইকে সর্বজয়া নেমন্তন্ন করেছে, যদি দুগ্গার সঙ্গে তার সম্বন্ধ হয় এই ভেবে। রান্না সেই মোটা চাল, পেঁপে-ডুমুরের ডালনা, থোড়ের ঘন্টের সঙ্গে কিন্তু চিংড়ির ঝোলও ছিল। ভবঘুরে হরিহরের শিষ্য লক্ষ্মণ মহাজনের বাড়িতে বাটি ভরা মাছ দেখে অপু ভাবছে — অত বড়ো গলদা চিংড়িটা কি শুধু তার একার জন্যে ?

চিংড়ি মাছের সোয়াদের কথা কী আর বলব — 'জগৎ জুড়ি যশোগাথা' মহারাজের। 'কঙ্কাবতী' খ্যাত ত্রৈলোক্য মুখুজ্যে তাঁর 'ইয়োরোপ ভ্রমণে' বলেছেন, সাধারণ গ্রিন স্যালাডে গলদা চিংড়ি সেদ্ধ করে কুচিয়ে দিলেই লবস্টার স্যালাড, সবাই সেটা ভারি আদর করে খায়।

এখন বাঙালি আর বেড়াতে গেলে শিমূলতলা, যশিডি, মধুপুর যায় না, তবে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান বা যে-দেশেই যাক চিংড়ির আদর সর্বত্র। যদিচ বাঙালির রান্না তারা জানে না, সেদ্ধ মাছ নুন-মরিচ আর নানারকম সস্ ঢেলে খেয়েই তারা অজ্ঞান, একটু শব্দ বদল করে নিয়ে বলতে পারি — 'অরাঁধুনির হাতে পড়ে চিংড়ি মাছ কাঁদে/না জানি রাঁধুনি মোরে কেমন করে রাঁধে।' কোনো ভোজে খেতে গিয়ে বিদ্যাসাগর মশাই একবার দেখলেন যে, শ'বাজারের জামাই অমৃত মিত্তির পাতে একটা মাছের মুড়ো ফেলে রেখে উঠে পড়েছেন। দেখা মাত্রই পাত থেকে সেই মুড়ো তুলে নিয়ে তিনি চুষতে আরম্ভ করেন। কায়েতের এঁটো খেয়ে তাঁর জাত যাওয়া দেখে সবাই হতভম্ব। কিন্তু যিনি বিধবার বিয়ে দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন, এই এঁটো খাওয়া তাঁর কাছে কোনো ব্যাপারই নয়। তবু হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বন্ধু এবং জীবনীলেখক বেলেঘাটার গণপতি সরকার বলেছিলেন, ওই মুড়োটা রুইয়ের নয় কারণ সেটা চুষে নয় ভেঙে এবং বসে খেতে হয়, সুতরাং সেটা বড়ো চিংড়ির মুড়ো, সকলেই তাই বলবেন।

মেয়েরা কলকাতার চিংড়ি মাছ নিয়ে বড়ো আদিখ্যেতা করে। তাই না ভাইফোঁটা আর জামাইষষ্ঠীর দিনে তার অমন পিলেচমকানো দাম হয়। খুব পুরোনো রেকর্ডসংগীত থেকে তাদের চিংড়িপ্রীতির একটা অন্তত গান তুলে দিচ্ছি —বড়ো চিংড়িতে কপিতে যদি খেতে হয়/বড়ো সুখোদয় এ কথা নিশ্চয়/বসে কার্পেটের আসনে/ঢেলে পবিত্র বাসনে/তুলে মুখে ঠাসি সুখে/স্বর্গে যাচ্চি মনে হয়/চিংড়ি ফুলকপির ঝোলে জগৎজন কান্না ভোলে/অরুচি অসুর মানে পরাজয়।

আমাদের রবীন্দ্রনাথ গলদা চিংড়ি তিংড়ি মিংড়ি লিখেই রাজপুত্তুরকে ছেড়ে দিলেন বটে, কিন্তু কুচো চিংড়ি যেভাবে তাঁর লেখায় এসেছে তা কী করে ভুলি! গুরুচরণের মৃত্যুকালে তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের সংসার নিজের ঘরে এক পায়ের ওপর বসে, অন্য হাঁটুর ওপর চিবুক রেখে কাঁচা তেঁতুল, কাঁচা লঙ্কা আর কুচো চিংড়ির চচ্চড়ি দিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পান্তাভাত খাচ্ছিলেন — সেই 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' মনে পড়ছে তো? তারপর দেখুন শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ'-এ বাঁড়ুজ্যেমশাই কানে পৈতে জড়িয়ে, কচুপাতায় মোড়া চারটি কুচো চিংড়ি (সৈরভী জেলেনির ডালা থেকে যা তিনি হাতিয়ে নিয়েছিলেন) সহ উপস্থিত হলেন মধু পালের মুদির দোকানে । শিল্পী নন্দলাল সিংহল

ভ্রমণের সময় লক্ষ করেছিলেন — ওরা কুচো চিংড়ি ভেজে গুঁড়িয়ে তুলে রাখে, রান্নার ফোড়নের মতো ব্যবহার করে। অধ্যাপক নির্মাল্য বাগচীর মুখে শুনেছি, তিনি একদা কেরালায় এর্নাকুলাম থেকে শুরু করে শান্ত আরব সাগর উপকূলে বহু বহু ধীবর পল্লী ঘুরে দেখেছিলেন। কোচিন শহরে চীন দেশের মাছ-ধরা জালের ব্যবহার আছে। তাই দিয়ে অফুরন্ত কুচো চিংড়ি প্রত্যহ ধরা হচ্ছিল। চিংড়ি মাছের কিছু বিশিষ্ট চীনে রান্না থাকা খুবই সম্ভব । চীন জাপান ফেরত মানুষ যাদের দেখেছি, তাঁদের এদিকে নজর না থাকায় কিছু সংগ্রহ করা যায়নি। ঈশ্বর গুপ্ত না হয় সেকালের কবি, একালের মানুষদের কথাও তো শুনলেন। অতএব গলদা-বাগদার জন্যে কাঁদবেন না, ঘুষো চিংড়ি যদি জোটে তাতেই সন্তুষ্ট থাকুন।

সেকালের গল্পগাছাতেও গলদা চিংড়ির প্রসঙ্গ বিস্তর। পরশুরামের 'চিকিৎসা সঙ্কটের' প্রেসক্রিপশনগুলো সুভাষিতের মতো লোকের মুখস্থ ছিল। সেই বিপত্নীক নন্দবাবুর কতবার যে অসুখ হল! বেচারা 'Zানতি পার না' শুনতে শুনতে শেষ-মেশ ঢুকে পড়লেন এক লেডি ডাক্তারের চেম্বারে। নন্দবাবু যেদিন পিসিকে কাশী পাঠিয়ে বিপুলা মল্লিককে ঘরে আনলেন, তাঁর বন্ধুবান্ধব বিরাট ভোজে কপি আর গলদা চিংড়ি খেলেন।

সাগরময় ঘোষের 'হীরের নাকছাবি' বইটি অনেকেই পড়েছেন। মিত্র ঘোষের দোকানের সামনে টিনের চেয়ারে বসে বিভূতিভূষণ একদিন চুল কাটছিলেন। হঠাৎ তারাশঙ্কর এলেন। বিভূতিভূষণ জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার বাড়িতে কী রান্না হচ্চে ?' তারাশঙ্কর আর নিজের হাতে বাজার করতেন না, তবে শুনে এসেছিলেন ছেলে সনৎ বলছে, 'বাজারে গলদা চিংড়ি উঠেছে।' 'তখুনি বিভূতি বললেন, চলো যাই তোমার বাড়িতে।' ব্যস, চুল কেটেই তারাশঙ্করের মোটরে বিভূতিভূষণ সানন্দে চেপে বসলেন। পথে হাতিবাগানে রামলালের দোকান থেকে রাবড়ি, সন্দেশ নেওয়া হল, পটল-ভাজা, সোনা মুগের ডাল লাউ দিয়ে, সঙ্গে গলদা চিংড়ির মালাইকারি। এতসব খাইয়ে তারাশঙ্কর প্রথমে বিভূতিভূষণের প্রশংসা করে বললেন, 'দেখ তুমি এত বড় লেখক। কিন্তু আর কত দিন বনজঙ্গল নিয়ে লিখবে? দেশের দুর্দশা, মানুষের কষ্টের পরিসীমা নেই, দাঙ্গা মন্বন্তর কত কী গেল ! গণ্ডি ছেড়ে বেরিয়ে এসো।' বিভূতিভূষণ বললেন, 'যে জীবনধারা গ্রাম্য নদীর মতো মন্থর বেগে চলে আমি তাই বুঝি, কৃত্রিম প্লট সাজানো, প্যাঁচ কষা সিচুয়েশান তৈরি করা আমার আসে না।' তারাশঙ্কর বললেন, 'কালের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে না পারলে পিছিয়ে পড়বে।' মনে বড়ো ধাক্কা পেয়ে বিভূতি টালা থেকে সোজা চলে গেলেন টালিগঞ্জ। চারু অ্যাভেনিউতে কালিদাস রায়ের বাড়ি। প্রশ্ন

করলেন, 'দাদা, আমার লেখা কি সব মুছে যাবে ?' কালিদাস বললেন, 'তারাশঙ্কর মা সরস্বতীকে ভারি ভারি গয়না যতই দিক, তুমি তাঁর নাকছাবিতে যে হীরেটি বসিয়ে দিয়েছ তা গয়না ছাপিয়ে চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।' তা দেখুন এমন সুন্দর গল্পটি যে আমরা পেলুম তা তো গলদা চিংড়িরই দৌলতে !

গলদা চিংড়িকে নিয়ে একটি আশ্চর্য রূপকথা, সাহিত্য পরিষদে সেকালে পড়েছিলুম। এক রাজপুত্র কার যেন অভিশাপে সারাদিন চিংড়ি মাছের খোলসের ভেতর থাকতেন। তাকে আবার এক রাজকুমারী বিয়ে করে বসলেন। রোজ রাতে রাজপুত্র মানুষের বেশ ধরে রাজকুমারীর কাছে যেতেন। কী যেন দৈববাণী পেয়ে রাজকুমারী একদিন খোলসটা পুড়িয়ে দিলেন আর চিরদিনের মতো রাজপুত্র মানুষের রূপ পেলেন। বিদেশি রূপকথার ছাপ আছে এতে স্পষ্ট।

'চিংড়ি' নাম দিয়ে শিবশঙ্কর পিল্লাই মালয়ালি ভাষায় উপন্যাস লিখেছেন। জেলেপাড়ার মাঝখানে মেছোহাটার বর্ণনা তাতে খুব চমৎকার। বাংলা অনুবাদটিও ভালো।

কতকাল চিংড়ি মাছ খাইনি, খাবার আশাও নেই, তাই চিংড়ি রান্নার কথা নিয়ে বই পড়ে কাটাই। বিপ্রদাস মুখুজ্যে আর প্রজ্ঞাসুন্দরীর বই খুব ভারী, সর্বদা রাঁধার নয়। দীঘাপাতিয়ার কিরণলেখার বইটি আমার কাছে সব দিক দিয়ে ভালো মনে হয়। এখন রান্না কত সহজ হয়ে গেছে, তখন শিলনোড়া, হামানদিস্তে, ঝাঁঝরি, বঁটি, ফুরুনি আর কাটারি এই মোটে ছিল। তখন কত কষ্ট করে কাটলেট, ক্রোকেট (যাকে আমরা পাশবালিশ বলতুম) করা হত। দই চিংড়ি, পোলাও, কোপ্তা সবই হত, সময় নিত বিস্তর। কেমন খেতে হত বলতে পারিনে। হয়তো এখনই ভালো হয়। মালাইকারি বলতুম কিন্তু রাবড়ি-মালাই তো নয়। হয়তো রান্নাটা ইন্দোনেশিয়া মালয় দেশ থেকে এসেছে। কিরণলেখাও বলেছেন সিলোন কারি। বইখানা আবার কেন ছাপানো হয় না?

আনারস-চিংড়ি কিংবা আনারস-ইলিশ প্রচুর লঙ্কাবাটা দিয়ে সাজিয়ে দিলে দেখায় যেন ফুল ছিটনো। তায় আবার ঝাল মিষ্টি মেশানো চমৎকার গন্ধ ভুরভুর করতে থাকে। আমার এক বন্ধুর শাশুড়ি এটি রাঁধতেন, শাশুড়ির সঙ্গে বন্ধুও চলে গেছেন। সেই হাত না হলে কার হাতে রান্না উৎরোবে? মনে পড়ছে জ্যোতির্ময়ী দেবীর গল্প। 'এম. পি'। নিজেই (তিনি নায়ক) মা মৃত্যুশয্যায় জেনে দিল্লি থেকে এসে হোটেলে উঠেছেন। শ্রাদ্ধের দিন দাদারা খালি গায়ে ব্যস্ত-সমস্তভাবে ঘোরাঘুরি করছেন, দিল্লি-নিবাসী আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে — তাঁর হঠাৎ মনে হল বাগদা চিংড়ি আর কাঁচকলা দিয়ে লম্বা উস্‌সুন্নি একটা

ঝোল রাঁধতেন মা। তেমন ঝোল দিল্লি গিয়ে অবদি আর খাওয়া হয়নি। এক-একটা রান্নায় এক এক জনের হাত থাকে। সেই রান্না যদি মায়ের হাতের হয় আর মা যদি না থাকেন তা হলে তার তুলনা কি তিন ভুবনে পাওয়া যাবে? রান্নাকে ভালো না বাসলে কী করে রান্না ভালো হবে? চিংড়ি-করমচা, মনোমোহিনী চিংড়ি চচ্চড়ি, রাঁধতে রাঁধতে কিরণলেখাকে স্মরণ করবেন। চিংড়ি মাছের মায়ারানী আর উমারানীতে বনলতা দেবীর স্মৃতি মেশানো।

ভালো রান্না মানে বেজায় ভালো। যাকে আজকালের ছেলেরা বলে 'দারুণ', তাই মাংস খেলে মনে হয় রেঁধেছে বুঝি রানাঘাটের 'হাজারী ঠাকুর'! হাতা-খুন্তির সঙ্গে মনের ভালোবাসার ফোড়নে সেকালের রান্নার এত সুগন্ধ ছড়াত — মুক্তাগাছার রেণুকা দেবী চৌধুরানিকে নুরু বাবুর্চি অভয় দিয়েছিল, কোনো কিছু ভুলে যান যদি তবে মা আমাকে স্মরণ করবেন। আমাদেরও সামান্য রান্না যে শিখিয়েছিল তাকে মনে করে রাঁধলে অসামান্য নিশ্চয় হবে। চিংড়ি রাঁধিয়ে রত্নাকরের ভাষায় বলি, 'মা কথাটি সারিলা, নেউটিয়া গছ মরিলা ।'

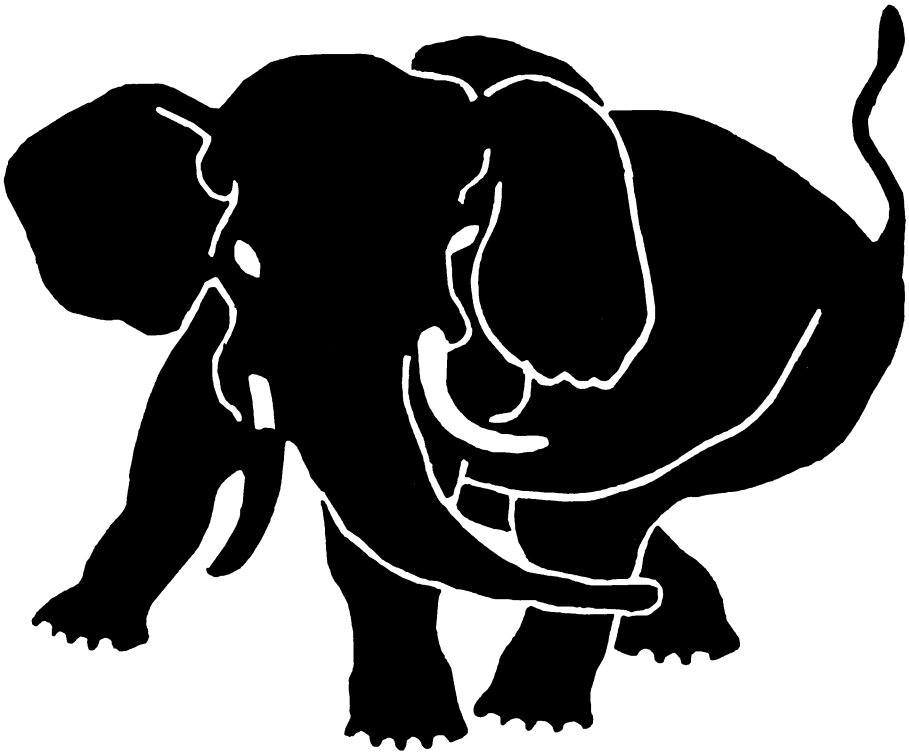

গজে চ জলদা দেবী

ভারতীয় সভ্যতার প্রথম দিন থেকে হাতি আমাদের জড়িয়ে রেখেছে। এটা যে কত বড়ো সম্পদ আর সৌভাগ্য তা সহজে বলে শেষ করা যায় না। বয়েস বাড়লে কথা বলার লোভও বাড়ে, চেষ্টা করেই দেখি না হাতির মাহাত্ম্য কীর্তনের। 'মাছ বাদে কাঁটা ধরে দেওয়া' হবে, তাই হোক । প্রথমে দেখুন মোহেনজোদারোর সিলমোহরগুলো — যার একটায় হাতি এখনও পুরোপুরি স্পষ্ট। এছাড়া হাতির দাঁতের চিরুনি আর গহনার কুচিও সেখানে পাওয়া গেছে। বৈদিক যুগে অর্থাৎ কঠোপনিষদে আছে, নচিকেতা যমকে তাঁর হাতি-ঘোড়া সব ফেরত দিচ্ছেন । আলেকজান্ডার আসার দিন থেকে ইতিহাসের যুগ শুরু হল। তাঁর সেনাপতি 'বিজয়ী' সেলিউকাসের সঙ্গে সন্ধি হল চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের । কাবুল কান্দাহারের বদলে চন্দ্রগুপ্ত পাঁচশো হাতি দিলেন। মেগাস্থিনিসের বিবরণে আছে চন্দ্রগুপ্তের সেনাবাহিনীতে ন-হাজার হাতি ছিল।

সম্রাট অশোকের স্তম্ভশীর্ষে হাতির কোনো একক মূর্তি হয়তো ছিল, কেননা হাতি পৃথিবীতে বুদ্ধের আবির্ভাবের প্রতীক। কিন্তু এখন তো অধিকাংশ স্তম্ভই ভাঙা । সারনাথের স্তম্ভশীর্ষে সুন্দর চারটি ঘেঁষাঘেঁষি সিংহের যে মূর্তি আছে, ভারত রাষ্ট্রের প্রতীক হবার পর তা এখন জগদ্‌বিখ্যাত । পণ্ডিতেরা বলেন তাতে কিঞ্চিৎ পারসিক এবং গ্রীক প্রভাব আছে। কিন্তু তাদের পায়ের ঠিক নীচে চক্রের মাঝখানে যে হাতির মূর্তি আছে, সেটি সম্পূর্ণ ভারতীয়। সম্রাট অশোকই তাঁর শিলালিপি আর স্তম্ভলিপি দিয়ে হাতিকে সারা ভারতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। দেরাদুন জেলার কালসিতে শিলাগাত্রে উৎকীর্ণ হাতির নীচে লেখা 'সেতো' (শ্বেতো)। শ্বেতহস্তীই মঙ্গলের সর্বশ্রেষ্ঠ চিহ্ন । বুদ্ধের জন্মের পূর্বে মায়াদেবী স্বপ্ন দেখেন তাঁর গর্ভে শ্বেতহস্তী প্রবেশ করছে।

'শকুন্তলা' নাটকের প্রথমে তপোবনে মত্ত হস্তী প্রবেশ করে কী উৎপাত শুরু করে তা সবাই জানেন। কৌশাম্বীর রাজা উদয়ন বীণা বাজিয়ে হাতি ধরতেন। বনের মধ্যে আরণ্য গজকে ধরতে গিয়ে অবন্তীরাজের ছলনায় তিনি বন্দী হন। রাজকন্যা বাসবদত্তাকে বীণা শেখাতে শেখাতে তাঁকে নিয়ে হাতি চড়ে পালিয়ে যান। এই প্রণয়কথা কাব্যে, নাটকে, মুদ্রায় এমনকী মাটির ফলকেও মুদ্রিত হয়। অবন্তীরাজ্যের গ্রামবৃদ্ধেরা সবাই ছিলেন উদয়ন-কথা-কোবিদ। কালিদাসের পরে ভবভূতির বর্ণনায় পাই বুনো হাতি। তারা জঙ্গলের শল্লকী গাছগুলো মট্‌মট্‌ করে ভাঙছে — তা থেকে ঠাণ্ডা, ঝাল আর কষা একরকম গন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে। অন্যত্র যুবা হাতি তার সঙ্গিনীকে নিয়ে ভাগ করে খাচ্ছে পদ্ম আর মৃণাল।

কলিঙ্গ জয়ের পর অশোকের জীবনে যে পরিবর্তন আসে ভাস্কর্যে তার নমুনা দেখি ধৌলিতে। কাল্‌চে ছোটো একটা পাহাড় থেকে বেরিয়ে আসছে আধখানা হাতি — পুরোনো ধর্মের অন্ধকার গুহা থেকে যেন নবধর্মের আবির্ভাব হচ্ছে। অনেক বিজ্ঞ পণ্ডিত ওই হাতিকে প্রমাণ মাপের বলে গেছেন। কিন্তু তা নয়, শিল্পকৌশল ছাড়াও খোলা আকাশের নীচে শব্দহীন শূন্যতায় ওই কথাই মনে হয়। ১৯৫৪ সালে ভুবনেশ্বর থেকে বহু কষ্টে হেঁটে ওখানে পৌঁছে মানুষ পাশে রেখে যে ছবি তুলেছিলাম তাতে বোঝা যায় হাতির উচ্চতা মাত্র চার ফুট। এখানেও 'গজতমে' লেখা থাকলে ভালো মানাত। ইলোরার ধ্বজস্তম্ভের দুই পাশে আছে কালো পাথরের দুই অতিকায় হাতি। গুহার ভেতরে পাহাড়ের স্তূপকেই কেটে এবং চেঁচেছুলে হাতির আকার দেওয়া হয়েছে। হাতির গায়ে মানুষকে দাঁড় করিয়ে যে ফোটো নেওয়া হয়েছে তা থেকে বোঝা যাচ্ছে এক একটি হাতি মোটামুটি বারো ফুট উঁচু আর পূর্ণবয়স্ক ও পরিপুষ্ট। এত পরিপূর্ণ শরীরের খাড়া দাঁড়ানো একক হাতি ভারতের অন্যত্র নেই বলে মনে হচ্ছে। কতদিনে কত মানুষের প্রচণ্ড পরিশ্রমে পাথরের স্তূপ এভাবে হাতির আকার পেয়েছে ভাবলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

এদিকে-ওদিকে ছোট হাতিদের বাদসাদ দিয়ে বড়ো হাতির খোঁজে কোনারকে আসা যাক। তার উত্তর দ্বারে দুই সুসজ্জিত হস্তিমূর্তি। তারা শুঁড়ে জড়িয়ে বন্দীকে তুলে ধরেছে যেন এখুনি আছড়ে মারবে — যেমন ভয়ংকর দৃশ্য তেমনি নিপুণ খোদাই। মধ্যভারতে সাঁচির দুই তোরণে দেখি অজস্র হাতির মেলা, তার ছবি দেখলেই যেন নেশা ধরে। এত সমারোহ, এমন উজ্জ্বল সুষমা সেযুগে ছিল।

সাহারানপুর, গাড়োয়াল অঞ্চল, কুমায়ুন, মহীশূরের জঙ্গল, ত্রিপুরা ও আসামে হাতির বসবাস। ১৯৩৭ পর্যন্ত বার্মা তো ভারতের মধ্যেই ছিল, কিন্তু সেদেশের হাতি নিয়ে

কোনো ভালো বই (নিশ্চয়ই যা ছিল) আমি দেখিনি। প্রচুর শিক্ষিত বাঙালি তখন রেঙ্গুনে থাকতেন । রেঙ্গুনি বৌদ্ধেরা বাংলা অক্ষরে অনুবাদ সহ ত্রিপিটক ছাপছিলেন। তাঁদের কাছে খোঁজ নেবার তো আর উপায় নেই। রেঙ্গুনের সাদা হাতি কলকাতার চিড়িয়াখানায় কখনও এসেছে কিনা, কর্তৃপক্ষ পুরোনো রেকর্ড দেখে বলতে পারবেন। কোনো হাতি যেখান থেকেই ধরা হোক তার কেনা-বেচা সব হত শোনপুরের বিখ্যাত পশুমেলায়। অসমের ঘন সবুজ অরণ্য থেকে এসে হাতিরা বিহার কিংবা উত্তরপ্রদেশে জমিদারের খেয়ালে চড়া রোদে খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে অনেক সময় অন্ধ হয়ে যেত। হাতি ছিল স্টেটাস সিম্বল। তাই কিনতেই হত, কিন্তু হাতির পরিচর্যা আর ছোটোখাটো তদারক কে করে ! শোনপুরের মেলায় চশমা পরা হাতিও বিক্রি হত, পত্রিকায় পড়েছি।

হাতির দাঁতের গহনা আর আসবাবপত্র নিয়ে ভারত সরকার ষাটের দশকে একটি ভালো স্মারক বের করেছিলেন; গেজেটিয়ার জাতের । বিদেশি ট্যুরিস্টদের চেষ্টায় 'টুনি' নামের একটা রঙিন ছবিতে ভরা বই দেখেছি। টুনি একটি ছোটো ছেলে, যে হাতি চড়তে ও চালাতে ওস্তাদ । মহীশূর রাজ্যে অল্প বয়েসের এক ওস্তাদ মাহুত ছিল। তার নাম সাবু। সে ফিল্মের প্রয়োজনে এখন বহুদিন আমেরিকায়। কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাথ থেকে 'সাবু দি এলিফ্যান্ট বয়' বইটা কিনেছিলুম। অনেকদিন সেটা আর নেই । মার্কিন প্রবাসী ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় 'চিফ অফ দ্য হার্ড' নামে একটি চমৎকার বই লিখেছিলেন, তা আর পাওয়া যায় না। তার বাংলা অনুবাদ বেরোয় এম. সি. সরকার থেকে 'যূথপতি' নামে। সেখানে এক দাঁতাল সর্দার তার আত্মকথা বলে যাচ্ছে।

আফ্রিকার হাতি নিয়ে বাংলা বই দেখিনি। সম্রাট জাহাঙ্গির আত্মকথায় বলেছেন — ইথিওপিয়া থেকে জাহাজে চড়িয়ে সভাসদ মুকাবর খাঁ তাঁকে একটি হাতি উপহার দেন। জাহাঙ্গির লক্ষ করেছিলেন হিন্দুস্তানের হাতির তুলনায় তার কান শুঁড় এবং ল্যাজের আকার বেশ বড়ো । বাদশা আকবর বা জাহাঙ্গিরের হস্তিশালার এলাহি ব্যাপার। বলতে গেলে বড়ো প্রবন্ধ ফাঁদতে হবে, পদে পদে তুজুক বা আকবরনামা দেখতে হবে। এই হালকা লেখার সঙ্গে ইতিহাস বা কোনো কোষগ্রন্থের কোনো সম্পর্ক নেই, তাই ও প্রসঙ্গ বাদ গেল।

শেক্‌স্‌পিয়র নিজে হাতি দেখেছিলেন কিনা জানা নেই, তবে 'জুলিয়াস সীজারে' আছে। সীজারের মৃত্যুর ঠিক আগের রাতে ক্যাসিয়াস ব্রুটাসকে বোঝাচ্ছেন — ভালুককে ঘাবড়ানো যায় আরশি দেখিয়ে, আর হাতিকে ফাঁদে ফেলা যায় গর্তে ফেলে — 'বেয়ার্‌স্‌ উইথ গ্লাসেস, এলিফ্যান্টস্‌ উইথ হোল্‌স্‌ ।'

অমরকোষ অভিধানে হাতির প্রতিশব্দ আছে উনিশ কুড়িটা। অশ্বত্থের ডালপালা খেতে সে ভালোবাসে, তাই ওই গাছটার নামই হয়ে গেল কুঞ্জরাশন, অর্থাৎ হাতির খাদ্য । প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'আদরিনী' গল্প পড়ার পর থেকে জানতে ইচ্ছে করে হাতিকে ভালোবাসার এমন গল্প অন্যত্র আছে কি না। হাতি অমন পাহাড়ের মতো প্রকাণ্ড হলে কী হবে, সবাই তাকে ভালোবাসে। তাই তো মেওয়া বেচা কাবুলিওয়ালারা সর্বদা মিনিদের জন্যে পকেটে 'হাঁথি' নিয়ে বেড়ায়। হাতি শুঁড় দিয়ে জল ছেটায় বলেই আকাশে বৃষ্টি নামে — মিনি ঠিকই বলে।

অসমে গোয়ালপাড়ার রাজা প্রভাত বড়ুয়া র দুই ছেলে প্রমথেশ আর প্রকৃতীশ (লালজী) দুজনেই হাতির ভক্ত। তাঁদের বোন নীহারবালাও 'হস্তির কন্যা' জাতীয় গান সংগ্রহ করে গেছেন আজীবন। প্রমথেশের হাতি জং বাহাদুরকে সাড়ে দশফুট শরীর নিয়ে নিউ থিয়েটার্সের 'মুক্তি' ছবিতে দেখা গেছে। প্রকৃতীশ দাদাকে ভালোবাসতেন। কিন্তু তাঁর হাতি যে নিজের হাতির চেয়ে উঁচুতে বড়ো ছিল এটা সইতে পারতেন না। তর্কে হেরে গিয়ে বলতেন — জংবাহাদুর বড়ো গোমড়ামুখো, আর আমার প্রতাপের দেখ তো সর্বদা হাসিমুখ ! 'বারোমাস' পত্রিকায় (শারদীয় ১৯৭৮) প্রকৃতীশ বা লালজী তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ চৌদ্দ বছরের — যতদিন প্রতাপসিং বেঁচে ছিল সেই আনন্দময় বনবাসের — অতি বিচিত্র এবং নিপুণ বর্ণনা দিয়ে গেছেন । প্রতাপসিংকে ভালোবেসে ঐশ্বর্য, প্রাসাদ, বিলাস, সংসার, স্বাচ্ছন্দ্য সব ছেড়ে তিনি জঙ্গলের ভিতর মাটিতে পাতার শয্যায় শুয়ে কাটিয়েছেন। 'বারোমাস' পড়ার পর সুযোগ এল পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্যের 'হাতির সঙ্গে পঞ্চাশ বছর' পড়বার। বইয়ের সারাংশ ভূমিকায় তুলে ধরেছেন ধৃতিকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী মশাই, একডাকে যাঁকে হস্তি-বিশেষজ্ঞ বলে এযুগে সবাই চেনে। হাতির অসুখ করলে লালজী নিজের বুক চিরে রক্ত দেবার মানত করেন। প্রতাপের মৃত্যুর পরে লালজীর জীবন শূন্য হয়ে যায়, তিনি গয়ায় গিয়ে নিজের মা ও বাবার সঙ্গে হাতি প্রতাপেরও পিণ্ডদান করে আসেন। প্রাসাদের দেয়ালে প্রতাপের মস্ত অয়েল পেন্টিং করিয়ে তার সামনে উন্মাদের মতো বিলাপ করতেন — প্রতাপ তাঁকে যেমন ভালোবাসত সেই ভালোবাসা আর কোথাও তিনি পাননি। প্রতাপের নামে তিনি অসম প্রদেশের প্রথম পশুচিকিৎসালয় স্থাপন করেন। পশুকে ভালোবেসে ভালোবাসার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন এই পাগল রাজকুমার লালজী।

'এলিফ্যান্টস্ অ্যান্ড এথ্নোলজিস্টস' একখানা উৎকৃষ্ট বই, কিন্তু ছবিসর্বস্ব, তাই কিছু বলতে পারা গেল না সে বই থেকে। উইলিয়ম বাজের 'জাস্ট এলিফ্যান্ট্স্' একটি উন্মাদনাময় বিচিত্র বই। ইন্দোচীন, লাওস, আনাম, কাম্বোডিয়া, এই ভূখণ্ডের হাতিদের

প্রায় সম্পূর্ণ বিবরণ। ভিয়েতনামের সম্রাট বাও দাই বলেছেন, 'হাতি নিয়ে পৃথিবীতে হাজার হাজার বই আছে। কিন্তু অগণিত তথ্য, উৎকৃষ্ট ফোটোগ্রাফ, বিচিত্র ঘটনার সমাবেশে উপন্যাসের মতো মনোরম এমন বই বোধ হয় বেশি নেই। কোনো আড়ম্বর বা বিজ্ঞাপন নেই, তবু বইটা পড়তে বসলে ছাড়া যায় না। হাতি শিকার-রূপ দুঃখবরণের সুখে আনন্দের উদ্ভাস মাখা এ বই — বাজে ছাড়া আর কেউ লিখতে পারতেন না।' একদল হাতির খোঁজে পিছু ধাওয়া করে সঙ্গ নেওয়াই ছিল এঁদের জীবনের বিচিত্র ক্ষুধা, যৌবনের সারাৎসার, বলিষ্ঠতার প্রদর্শনী। শিকারি ছাড়া এ বইয়ের মর্ম অনুভব সহজ নয়। বুদ্ধি আর অভিজ্ঞতাহীন গ্রাম্য লোক আমরা, শুধু দুটি একটি ঘটনাই তাই বলি। বাজের নিজের গজদন্তের সংগ্রহ ভালো ছিল তবু একজন মান্দারিন (কর্মচারী) তাঁকে নিজের সংগ্রহ দেখিয়ে স্তম্ভিত করে দেয়। সেটা হল — দেড়শো পাউন্ড ওজনের দুটি দাঁত — কী সব ম্যাজিক তুকতাকের সাহায্যে সেটি সংগৃহীত হয়েছিল। আবার জাপান যুদ্ধের বিভ্রাটে মালিক সুদ্ধ সেই হাতির দাঁত জোড়া উধাও হয়ে গেল। আমাদের শ্যামবাজার থেকে বেহালা যাবার মতো, হাতিরা জঙ্গল ভাঙতে ভাঙতে অতি সহজে সারা ইন্দোচীন উপদ্বীপ চষে ফেলে বার্মার জঙ্গলে ঢোকে, সেখানে সব গাছপালা তছনছ করে কিছুদিন পরে আবার বেরিয়ে আসে । গোটা ইন্দোচীন ভূখণ্ডেই শ্বেতহস্তি বাদশার মতো মর্যাদা পায়। সম্রাটের একটি আদুরে শ্বেতহস্তিনী ছিল। সে ছিল ভারি জেদি, সবসময় নিজের ইচ্ছে মতন চলত । হাতি নিয়ে ওদেশে যেসব গল্প আর বিশ্বাস প্রচলিত ছিল তাও এ বইতে যথেষ্ট । দাঁতালের প্রেম নিবেদন, সঙ্গিনীর জন্য দুই প্রেমিকে লড়াই — এতেও বেশ ভালোভাবেই বলা আছে। একদন্ত বা বায়াগণেশের ওদেশে যথেষ্ট খাতির। তারা খুব লড়াইয়ে ওস্তাদ, দুই দাঁতওয়ালারা তাদের সঙ্গে প্রায়ই হেরে যায়। এ বইয়ের মতো সুন্দর হাতির ফটো সেযুগের বইতে বড়ো একটা দেখা যায় না — সংখ্যায় প্রায় পঞ্চাশ । হাতির শুঁড়ের কত বিচিত্র ব্যবহার, তাদের দল বেঁধে স্নান, এছাড়াও বাচ্চার জন্ম, মায়ের টান এসব কথা তো ফলাও করে আছেই — বাঘের সঙ্গে লড়াইও আছে। শিকারের রকমারি কায়দা, দড়ির ফাঁসে হাতি ধরা, তাঁবু ফেলা, গাছের ডালে অস্থায়ী কাঠের বাড়ি তৈরি, আরো টুকিটাকি । আঙ্কোরভাটের পথে হাতির দল, দূরে মন্দির দেখা যাচ্ছে — সব জড়িয়ে কী যে মনোরম বইখানি।

সব দেশীয় রাজ্যেই হাতি ছিল। গোয়ালিয়র রাজ্যে আফিম খাইয়ে হাতিকে শুইয়ে নানা রং গুলে তসবির লিখনেওয়ালারা মই বেয়ে তার গায়ে উঠে পড়েন, নকশা কাটেন। তিন চার রকমের রং ক্রমাগত বাতাস দিয়ে শুকিয়ে তার সাজসজ্জা চলে খুব আড়ম্বর করে। শ্রীমতী বুলু দেবী ওদেশে থাকতে এই বর্ণনাটি পাঠিয়েছিলেন।

রাজোয়াড়া নিয়ে লিখে খ্যাতি অর্জন করেছেন জ্যোতির্ময়ী দেবী। তাঁর 'রাজা-রানীর যুগ' থেকে একটু বলি, লর্ড কার্জন যখন দিল্লি দরবার বসালেন, তখন জয়পুররাজকে প্রচুর হাতি ধার দিতে হয়েছিল । ফেরার পথে মথুরায় ঠাণ্ডা লেগে পঞ্চাশ-ষাটটি হাতি মারা যেতে রাজা বড়ো বিরক্ত হলেন। কিন্তু লালমুখো রেসিডেন্টকে ভয়ে জানাতে পারেননি। মন্ত্রী এবং সভাসদদের কাছে বিরক্তি জানিয়েছিলেন। সেই সব হাতির রঙ ছিল মেঘের মতো, সারা গায়ে অগুনতি গয়না, কপাল-পাটি, দামি মালা, গজদন্তে নিরেট সোনার আংটি, পিঠে রঙিন হাওদা। ছোটো বাচ্চারা মায়ের বুকের দিকে দুই পায়ের মধ্যে ঢুকে পথ চলছে। কী সব নাম ছিল তাদের — গজরানী, গজবীর, গজকমল। এইসব দৃশ্য জয়পুরের মানুষ ভোলেনি।

হাতিকে আমরা নিরামিষভোজী বলেই জানি, কিন্তু কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে তাকে মদ আর মাংসও দিতে বলেছেন । রাজা জমিদারদের এত বর্ণাঢ্য হাতির কথার পর আমাদের গরিব ঘরের মায়ের কথা এই প্রসঙ্গে একটু বলি। এই শতাব্দীর শুরুতে আমার বাবা জলপাইগুড়ি ও ময়নাগুড়িতে সরকারি কাজে ছিলেন । সরকার থেকে তখন কাজের জন্য হাতি দেওয়া হত । এদিকে মাহুত প্রায়ই নালিশ করত — খাবার ঠিক সময়ে আসে না, খেদ্‌মত্‌গারেরা বিস্তর কামাই করে। বাবার অনুরোধে মা গিয়ে ঘাসের মোড়ায় বসে মধ্যে মধ্যে খাওয়া দেখতেন। রোজ তার খাবার ছিল তিন চার গাড়ি বট অশ্বত্থ ডুমুর পাকুড়ের ডালপালা, বুনো ফল আর দশ বালতি জল। মা গেলেই সঙ্গে বেশ কিছু ফল নিতেন । হাতি সেটা খুব বুঝত, কাছে আসতে চাইত । এদিকে মা ছিলেন খুব ভয়তরাসে। মাহুত বোঝাত — হাতি ওরই মধ্যে একটু কাছে এসে কান দুটি নেড়ে শুঁড় দোলাত । মা হাত নাড়তেন । হাতি বসার পর মা তার দিকে হাত নেড়ে নেড়ে ফল গড়িয়ে দিতেন, বেল, কাঁঠাল, জংলি আম, কলা, গুড় এই সব। সে আখের মাথাসুদ্ধ চিবিয়ে চিবিয়ে খেত । আনারস পেলে শুঁড়ে তুলে সবাইকে দেখাত । কলাগাছ হাতির খাদ্য হলেও তাতে খুব শুঁয়োপোকা থাকে । তাই সেগুলো কুচিয়ে পোকা বেছে দেওয়া হত । সন্না দিয়ে। এই ভালোবাসার দেওয়া নেওয়ায় — 'সেই সীতা নাড়ে হাতটি, বানর নাড়ে মাথা' — মাহুতের খুব আনন্দ ছিল সে খড়ের নুটি দিয়ে বসে থাকা হাতির পিঠ রগড়ে দিত, তার কপালে সরষের তেল আর সিঁদুর দিয়ে ফোঁটা কেটে দিত, আবার ঢোলক বাজিয়ে গান করার চেষ্টা করত । হাতির পায়ের তলার চামড়া মোটা অথচ নরম, কাঁটা ফুটে গর্ত হলে তাকে শুইয়ে আলকাতরা একটু গরম করে ঢেলে দেওয়া হত। তার চোখ দিয়ে জল পড়লে নিজেই শুয়ে পড়ে মাহুতকে ডাকত — একবার গোলাপ জল জাতের কী একটা দিয়ে তার কষ্ট কমে গেছিল তাই । কিন্তু এই গুণধর
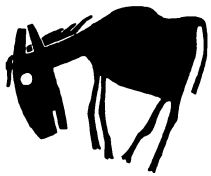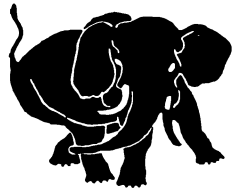
হাতি বেশিদিন রইল না। একদিন নদীর দিকে চলে গিয়ে নিজেই শুয়ে পড়ে। ডাক্তার চাওয়া হলেও সরকার ডাক্তার পাঠাননি। তার মৃত্যুর পরে একদল কুলি আর মিস্ত্রি আরো একটা হাতি নিয়ে এল। প্রচুর নুন দিয়ে হাতিকে কবর দেবার জন্যে গর্ত খোঁড়া হচ্ছে দেখে অন্য হাতির চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে থাকে। তাই দেখে মা চলে আসেন। আমার মাতামহ হাতি চিকিৎসার একটি ভালো বইয়ের কথা মাকে বলেছিলেন। ছাত্রজীবনে মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ তর্কবেদান্ততীর্থ পালকাপ্য ঋষির হস্তিশাস্ত্র, রোমপাদ রাজার প্রশ্নমালা, এসব কাহিনী বলেন। হস্তিতত্ত্ব আর গজায়ুর্বেদসংহিতা বই দু-খানাই বহু চেষ্টার পর কলেজ স্ট্রিটে পাই। মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী আর জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বহু পরিশ্রম আর অর্থব্যয় করে একশো বছর আগে এই অভিধান তুল্য বই দু-খানা ছাপান। এখানেই অন্ধের হস্তিদর্শন শেষ হল। ভুলত্রুটি রয়ে গেল, এখন 'যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং' হস্তিপ্রেমিকেরা নিজগুণে যেন মার্জনা করেন।